জনপরিষেবায় সরকারি ব্যয়
নিরীক্ষা প্রতিবেদন

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement | proian | Safety & Rights Promoting Safety, Enforcing Rights | The Asia Foundation

জনপরিষেবায় সরকারি ব্যয়
নিরীক্ষা প্রতিবেদন

নিরীক্ষা প্রতিবেদন : জনপরিষেবায় সরকারি ব্যয়

প্রকাশক
গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন

প্রকাশকাল
ঢাকা, আগস্ট ২০২২

গবেষণা
পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক- প্রান

সম্পাদনা
কাজী মারুফুল ইসলাম | আসগর আলী সাবরি | মনোয়ার মোস্তফা | এ আর আমান | মোহাম্মদ শহিদ উল্যাহ | মুসফিকুর রহমান | সেকেন্দার আলী মিনা | নুরুল আলম মাসুদ | উম্মে সালমা

প্রকাশনা সহযোগী
দি এশিয়া ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ

সার্বিক ব্যবস্থাপনা
সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)

যোগাযোগ
৬/৫এ স্যার সৈয়দ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭।
ইমেইল : democratic.budget@gmail.com

নিঃস্বত্ব
এই প্রকাশনাটি যে কোনো অবাণিজ্যিক কাজে যে কোনো মাধ্যমে ব্যবহার করা যেতে পারে। সূত্র উল্লেখ করার অনুরোধ রইলো।

মুখবন্ধ

জনপরিষেবামূলক কর্মকান্ডে একটি দেশের নাগরিকের অংশগ্রহণ সেই কাজের গুণগত মান বৃদ্ধি ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে। উন্নয়নমূলক কাজে সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, জনগণ যে কর প্রদান করে সে অর্থ কোন খাতে, কীভাবে এবং কতটুকু ব্যয় হয়, একটি সরকারি অধিদপ্তরের কর্মচারীরা তাদের কাজের জন্য জনগণের কাছে কতটুকু দায়বদ্ধ– বিবিধ বিষয়গুলো জনগণের জানার প্রয়োজন রয়েছে। কিন্তু তথ্যের সীমাবদ্ধতার কারণে জনগণ উপরিউক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে জানেন না। ফলে, জনপরিষেবামূলক কাজে জনগণ নিজেদের দায়িত্বও অনুশীলন করতে পারে না।

প্রতি বছর বাজেট ঘোষণার সাথে সাথে সরকার নাগরিকদের জন্য পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে বাজেটে বরাদ্দকৃত ব্যয় শুরু করে। কিন্তু, সরকারি পরিষেবা বা সম্পদ উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর কাছে ঠিক মতো পৌঁছাচ্ছে কিনা, যে উদ্দেশ্যে টাকা ব্যয় করা হচ্ছে তার কোনো প্রভাব পড়ছে কিনা, বরাদ্দকৃত টাকা সঠিকভাবে খরচ হচ্ছে কিনা ইত্যাদি স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকারের পাশাপাশি নাগরিকদেরও দায়িত্ব। সরকারি ব্যয় ট্র্যাকিং করার মাধ্যমে নাগরিকরা সরকারকে তার অর্থ ব্যয়ের প্রভাব, স্বচ্ছতা তৈরিতে সহায়তা করে। এর মাধ্যমে জনঅর্থায়ন, অর্থ স্থানান্তর এবং পরিষেবা সরবরাহ প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান সমস্যা, বাধা, দুর্নীতি এবং দুর্বলতাগুলো খুঁজে বের করা এবং সমাধান করা সম্ভব হয়। পাবলিক এক্সপেন্ডিচার ট্র্যাকিং বা সরকারি ব্যয় নিরীক্ষণ এক্ষেত্রে কার্যকর একটি পদ্ধতি। এর মধ্যদিয়ে সরকারি তহবিল প্রবাহ, সরকারি পরিষেবার মান, প্রবেশগম্যতা এবং ব্যয়ের মূল্যায়ন পাওয়া যায়।

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন (ডিবিএম) জন্মলগ্ন থেকে বাজেটের গণতন্ত্রায়ন, জনঅংশগ্রহণের জন্য কাজ করে আসছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে অংশগ্রহণমূলক বাজেট, বাজেটের গুণগত ব্যয় এবং তরুণদের মধ্যে বাজেট সাক্ষরতা নিয়ে কাজ করছে। বাজেট বিষয়ক দীর্ঘ অভিজ্ঞতার নিরিখে এই বছর ডিবিএম জনপরিষেবাখাতের কয়েকটি সেবার ব্যয় নিরীক্ষার উদ্যোগ নেয়।

এই বছর গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন স্বাস্থ্য, কৃষি, খাদ্য নিরাপত্তা এবং যুব উন্নয়ন খাতের সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দুর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা, কার্যকারিতা অনুসন্ধানের চেষ্টা করে। এজন্য সামাজিক নিরীক্ষা, ত্বরিত সমীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো এই পুস্তিকায় সংকলন করা হলো। আশা করি সমীক্ষাগুলোর মধ্যদিয়ে মাঠ পর্যায়ে জনপরিষেবার একটি চিত্র পাওয়া যাবে এবং এই নিরীক্ষাগুলোর ফলাফল ও সুপারিশের আলোকে সংশ্লিষ্ট নীতি-নির্ধারকগণ ভবিষ্যতে এই সকল সেবা মানোন্নয়নে আরো কল্যাণমুখী নীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করলে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে।

নিরীক্ষাটি দি এশিয়া ফাউন্ডেশন,বাংলাদেশের সহায়তায় ও সেইফটি এন্ড রাইটস সোসাইটি (এসআরএস)-এর ব্যবস্থাপনায় 'সিটিজেনস্ ইনিশিয়েটিভ ফর পার্টিসিপেরি বাজেট' প্রকল্পের একটি উদ্যোগ। নিরীক্ষাগুলোর পরিকল্পনা, নকশা প্রণয়ন, তথ্য সংগ্রহ, বিশ্লেষণ ও প্রতিবেদন তৈরি করেছে পার্টিসিপেটরি রিসার্চ অ্যান্ড অ্যাকশান নেটওয়ার্ক-প্রান, তাদেরকে ধন্যবাদ। প্রতিবেদন সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে।

সূচি

১. কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক : স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের কতখানি হিস্যা.. – ০১

২. টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম : কতোটা পেল নিম্ন আয়ের মানুষ – ০৮

৩. কৃষিসেচে সরকারি ব্যয় ও কৃষকের লাভ-ক্ষতি – ১৫

৪. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : যুব উন্নয়নে সরকারি ব্যয় কতটা ভূমিকা রাখছে – ২৩

কমিউনিটি স্বাস্থ্য ক্লিনিক:
স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয়ের কতখানি হিস্যা পায় প্রান্তিক মানুষ?

একটি দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নে স্বাস্থ্যসেবার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সাংবিধানিকভাবেই মানুষের সার্বিক সক্ষমতার জন্য উন্নয়ন আলোচনায় স্বাস্থ্যসেবা অগ্রাধিকারভিত্তিতে স্থান পেয়ে থাকে। 'বাংলাদেশের সংবিধান এর ১৫ নং অনুচ্ছেদে স্বাস্থ্যকে মৌলিক মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে এবং অন্ন বস্ত্র, আশ্রয় শিক্ষা ও চিকিৎসাসহ জীবনধারণের মৌলিক উপকরণের ব্যবস্থাকে রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হিসেবে স্বীকৃত করা হয়েছে। সংবিধানের ১৮ (১) অনুচ্ছেদ বলে, "জনগণের পুষ্টির স্তর-উন্নয়ন এবং জন স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধনকে রাষ্ট্র অন্যতম প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া গণ্য করিবে।" কিন্তু বাস্তবে স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে বিরাজমান নানা সমস্যার ফলে দরিদ্র, প্রান্তিক ও তৃণমূল জনগণ যথাযথ সেবাপ্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

জাতিসংঘের মতে, টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে 'সর্বজনীন স্বাস্থ্য' নিশ্চিত করতে স্বাস্থ্যখাতকে শক্তিশালী করা, বাজেটে যথাযথ বরাদ্দ দেওয়া এবং প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাংক ও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশে স্বাস্থ্যখাতে বছরে মাত্র ৩২ ডলার মাথাপিছু ব্যয় হয়। একই সময়ে এই খাতে দক্ষিণ এশিয়ার ভারতে ব্যয় হয় ৫৯ মার্কিন ডলার, নেপালে ৪৫, ভুটানে ৯১, শ্রীলঙ্কায় ১৫১ ডলার আর পাকিস্তানে ব্যয় হয় ৩৮ ডলার। বিগত প্রায় দেড় যুগের বাজেট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, স্বাস্থ্যখাত বরাবরই অবহেলিত। এই দীর্ঘ সময়ে স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ মোট জাতীয় বাজেটের ৪ দশমিক ২ থেকে ৬ দশমিক ৮ (গড়ে ৫ দশমিক ৫) শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে এবং জিডিপির ক্ষেত্রে তা ০১ শতাংশের নিচে থেকেছে। অর্থাৎ সরকারিভাবে স্বাস্থ্যখাতকে গুরুত্ব দিয়ে বরাদ্দ বাড়ানো হচ্ছে না। ফলে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় সরকারি ব্যয়ে পিছিয়ে পড়ছে বাংলাদেশ। একে তো স্বল্প বরাদ্দ, তার ওপর রয়েছে সীমাহীন দুর্নীতি, অর্থ ব্যয়ে অব্যবস্থাপনা ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা। (প্রথম আলো ১৯ মে ২০২১)

২০৩০ সালের মধ্যে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বর্তমান সরকার রূপকল্প ২০৪১ অনুযায়ী স্বাস্থ্যখাতে সরকারি ব্যয় ক্রমাগত বাড়িয়ে ২০৪১ সাল নাগাদ জিডিপির ২ শতাংশে উন্নীত করার কথা বলা হয়েছে। সরকারের স্বাস্থ্যনীতির প্রধান উপাদানের মধ্যে সরকারি স্বাস্থ্যক্লিনিকের সংখ্যা বৃদ্ধি,

স্বাস্থ্যসেবার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যখাতে সুশাসন জোরদার করা, স্বাস্থ্য তথা ব্যবস্থার মান উন্নয়ন, স্বাস্থ্যকর্মীদের সংখ্যা এবং মান বৃদ্ধি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

স্বাস্থ্যসেবাকে প্রান্তিক জনগণের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিতে সরকারের সেবা কাঠামোতে তৃণমূল পর্যায়ে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে ইউনিয়ন হেলথ কমপ্লেক্স, উপজেলা হেলথ কমপ্লেক্স, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিক। কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহ গ্রামীণ জনগণ, বিশেষ করে প্রান্তিক মানুষজনের জন্য স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ স্বাস্থ্যসেবাকে আরো উন্নত করবে।

জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে বর্তমান ক্ষমতাসীন সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিগত মেয়াদে ১৯৯৮ সালে টুঙ্গিপাড়ার গীমাডাঙ্গায় একটি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করেন । পরবর্তীতে দেশের বিভিন্ন ইউনিয়নের ওয়ার্ড পর্যায়ে ২০০০ সাল পর্যন্ত ১০ হাজারের অধিক ক্লিনিক স্থাপন করা হয়। সরকার পরিবর্তনের পর ২০০১ থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কমিউনিটি ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তী-তে ২০০৯ সালে 'রিভাইটালাইজেশন অফ কমিউনিটি হেলথ কেয়ার ইনিশিয়েটিভস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে এই কার্যক্রমটি পুনরায় চালু করা হয়।

কমিউনিটি ক্লিনিকের মূল উদ্দেশ্য হলো গ্রামীণ জনগণকে স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানের মাধ্যমে সার্বিক স্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি ঘটানো। নির্দিষ্টকৃতভাবে লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে-

১. বাংলাদেশের গ্রামীণ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে দরিদ্র, প্রান্তিক ও দুঃস্থ জনগোষ্ঠীকে মানসম্পন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা দেয়া;
২. একটি সমন্বিত উপজেলা ও জেলা স্বাস্থ্য ব্যবস্থার অধীনে সকল কমিউনিটি ক্লিনিককে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ এবং বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যার ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ের স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোর সাথে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহের একটি কার্যকরী রেফারেল লিংকেজ স্থাপন;
৩. নবজাতক, শিশু ও মাতৃস্বাস্থ্য সেবার মান উন্নয়ন;
৪. বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিক, কিশোর, তরুণ, প্রতিবন্ধী ও সুবিধাবঞ্চিত নাগরিকদের স্বাস্থ্যসেবা প্রদান।
৫. সর্বস্তরের জনগোষ্ঠীর জন্য ই-স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের মুখ্য কেন্দ্র হিসেবে কাজ করা;
৬. সকল পর্যায়ের স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টি সেবা প্রদানের কার্যকরী সমন্বয়ক ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাকে সংগঠিত করা।

তবে লিপিবদ্ধ এসকল লক্ষ্য, প্রত্যাশা মাঠ পর্যায়ে কতটা ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করেছে, গ্রামের সাধারণ, দরিদ্র মানুষের কাছে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিতে কতটা সফল হয়েছে, জনপরিষেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কতটা জনবান্ধব, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ প্রতিষ্ঠান হিসেব স্থানীয় সেবাগ্রহীতাদের কতটা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে অথবা তারা আর কী কী সেবা প্রত্যাশা করে, কী কী সংকট আছে বলে তারা মনে করে ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে এই প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়নের জন্য এই সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

সামাজিক নিরীক্ষার কৌশল ও উদ্দেশ্য

সামাজিক নিরীক্ষা একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেবা প্রদাসকারী ও গ্রহণকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দুর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের সমন্বিত মতামত জানা যায়। পরিষেবা প্রদানকারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা, স্বাস্থ্যসেবার জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা নিরীক্ষণ, সেবার মানবৃদ্ধিতে নীতি-কৌশল প্রণয়নে সুপারিশমালা তৈরি এবং যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য তৃণমূল তরুণদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে; যার মূল উদ্দেশ্য-

১. সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কমিউনিটি ক্লিনিকে বিরাজমান সম্পদের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
২. প্রায়োগিক ক্ষেত্রে কমিউনিটি ক্লিনিকে কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা;

৩. কমিউনিটি ক্লিনিকের ব্যবস্থাপনায় সাধারণ জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করা; এবং
৪. সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তৈরি করা

নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগলিক এলাকা

এই সামাজিক নিরীক্ষার কাজে নীলফামারী জেলার ডোমার উপজেলার তিনটি কমিউনিটি ক্লিনিক, যথাক্রমে- ৫ নং বামুনিয়া ফুলবাড়ি কমিউনিটি ক্লিনিক, লালবাজার বারবিশা বামুনিয়া কমিউনিটি ক্লিনিক এবং বামুনিয়া পাটোয়ারীপাড়া কমিউনিটি ক্লিনিককে নির্বাচন করা হয়। সেবাপ্রদানকারী, সেবাগ্রহীতা এবং পরিচালনা কমিটির নারী ও পুরুষদের মধ্যে দলীয় আলোচনা, সাক্ষাতকার (আধো-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নোত্তর), সেবাপ্রদানকারী ও গ্রহীতাদের মধ্যে আলোচনা পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতিষ্ঠান নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যন্ত এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিকের কথা বিবেচনা করা হয়েছে।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

এই নিরীক্ষার জন্য বিভিন্ন উৎস থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ উপায়ে সরাসরি মাঠ পর্যায়ে সেবাপ্রদানকারী এবং সেবাগ্রহীতা উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটারবেজড সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ধরণ

কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যয় এবং স্বাস্থ্যসেবা পরিস্থিতির ওপর এই নিরীক্ষা কার্যক্রমে ১০০ জন সেবাগ্রহীতা, ৫ জন সেবা প্রদানকারী, এবং ১৫ জন কমিউনিটি পরিচালনা গ্রুপ সদস্যসহ সর্বমোট ১২০ জন অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীসেবাগ্রহীতাদের মধ্যে ২১ শতাংশ পুরুষ ও ৭৯ শতাংশ নারী। অন্যদিকে সেবাপ্রদানকারী ৫ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২ জন নারী এবং ৩ জন পুরুষ রয়েছে। এছাড়া কমিউনিটি পরিচালনা গ্রুপ সদস্য উত্তরদাতাদের ৩ জন নারী ও ১২ জন পুরুষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সামাজিক নিরীক্ষা ফলাফল

স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের জন্য ক্লিনিকে গমনের হার

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সেবাগ্রহীতাদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা গত এক বছরে অসুস্থ হয়ে কতবার কমিউনিটি ক্লিনিকে গিয়েছিলেন। তাদের মধ্যে ১ বার মাত্র ক্লিনিকে গিয়েছিলেন ৩ শতাংশ, ২ বার গিয়েছেন শতকরা ২৬ শতাংশ, ৩০ শতাংশ ৩ বার, ১১ শতাংশ ৪ বার এবং ৩০ শতাংশের বেশী রোগী ৫ কিংবা ৫ এর অধিক সংখ্যকবার ক্লিনিকে সেবার জন্য গিয়েছেন। তবে, বেশিরভাগ রোগী সাধারণত এক বছরে ২ থেকে ৩ বার ক্লিনিকে গিয়ে থাকেন।

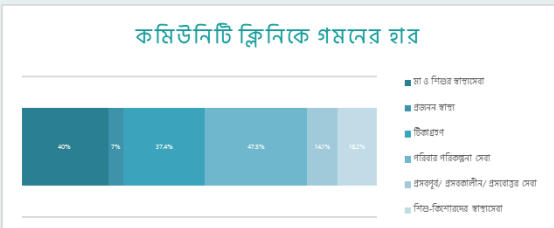

কমিউনিটি ক্লিনিকে যে সেবার জন্য গিয়েছে

সারা দেশে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলোতে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবা, প্রজননস্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, টিকাদান কর্মসূচি, পুষ্টি, স্বাস্থ্যশিক্ষা, পরামর্শসহ বিভিন্ন সেবা প্রদান করার কথা থাকলেও অংশগ্রহণকারীদের ৫২.৫ শতাংশ শুধুমাত্র পরামর্শ করার জন্য ক্লিনিকে গিয়েছিলেন। অন্যান্য উত্তরদাতারা মা ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রজনন স্বাস্থ্য, টিকাদান, পরিবার পরিকল্পনা, প্রসূতিসেবা, শিশু কিশোর প্রজনন স্বাস্থ্যসেবার মতো প্রয়োজনীয় সেবার কথা জানিয়েছেন।

কার্যদিবসে ক্লিনিক সেবা

অংশগ্রহণকারীদের থেকে প্রাপ্ত তথ্য থেকে দেখা যায়, ৮৮.৮ শতাংশ উত্তরদাতা তাদের জবাবে জানিয়েছেন তারা কার্যদিবসে সেবার জন্য গিয়ে ক্লিনিক খোলা পেয়েছেন। অবশিষ্ট ১১.২ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তারা সেবার জন্যে গিয়ে ক্লিনিক বন্ধ পেয়েছেন। এদের সবাই সকাল ১১টা থেকে বেলা ১টার মধ্যে

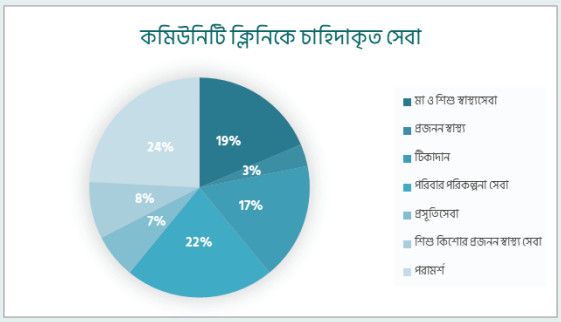

ক্লিনিকে সেবার জন্য গিয়েছিলেন, বন্ধ থাকার কারণে সেবা পাননি বলে জানান।

সেবার পর্যাপ্ততা

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবার পর্যাপ্ততা বিষয়ে জানতে চাওয়া হয়েছিল। এদের মধ্যে ৭৪ শতাংশ উত্তরদাতা কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রাপ্ত সেবা নিয়ে তাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন। ২২ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তারা ক্লিনিক থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা পাননি। বাকি ৪ শতাংশ উত্তরদাতা এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি। সেবা নিয়ে অসন্তুষ্টি জানানো অংশগ্রহণকারীদের ১৭ জন অপর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধা, ৩৬ জন প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, ১৮ জন অংশগ্রহণকারী দক্ষ লোকবলের অভাব, ১৮ জন ডাক্তারের অনুপস্থিতিকে দায়ী করেছেন। রোগী-দের পর্যাপ্ত সেবা প্রাপ্তি বিষয়ে ৪৫ শতাংশ কমিউনিটি পরিচালনা কমিটি সদস্য মনে করেন রোগীরা তাদের জন্য প্রয়োজনীয় সেবা পান না। এর পেছনে তারা বরাদ্দের অপ্রতুলতা, অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতা, প্রয়োজনীয় উপকরণের অভাব, দক্ষ লোকবলের অভাব ইত্যাদি কারণকে উল্লেখযোগ্যভাবে দায়ী করেন। অংশগ্রহণকারী ৮০ শতাংশ সেবাপ্রদানকারী জানান ক্লিনিকে আগত রোগীরা চাহিদাকৃত সেবা পান না। এজন্যে তারা বাজেটের অপর্যাপ্ততাকে সবচেয়ে দায়ী করেন।

ঔষুধের তালিকা প্রদর্শন এবং ঔষধের প্রাপ্যতা

অংশগ্রহণকারী সেবাগ্রহীতা এবং সেবাপ্রদানকারীদের মধ্যে ৫৯ শতাংশ জানিয়েছেন ক্লিনিকে ঔষধের তালিকা টাঙানো রয়েছে। বাকীদের ১৮ শতাংশ জানান ঔষধের তালিকা টাঙানো নেই এবং ২৩ শতাংশ এই বিষয়ে জানেন না বলে জানান।

নীতিমালা অনুযায়ী কমিউনিটি ক্লিনিকে আগত রোগী-দের সেবা দিতে বর্তমানে ২৭ ধরণের ঔষধ এবং ৩ ধরণের পরিবার-পরিকল্পনা সামগ্রী সরবরাহের কথা থাকলেও সেবাদানকারী বা সেবাগ্রহীতা কারোর উত্তরেই সকল ঔষধগুলোর নাম উঠে আসেনি। সেবাগ্রহীতাদের অধিকাংশই ক্লিনিক থেকে আয়রন, প্যারাসিটামল, ওর‍্যাল স্যালাইন, মেট্রোনিডাজল ঔষুধ পেয়েছেন। অন্যদিকে ক্লিনিকে কী কী ঔষধ পাওয়া যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে অংশগ্রহণকারী সেবপ্রদানকারীদের অধিকাংশই প্যারাসিটামল, এন্টাসিড, ভিটামিন ট্যাবলেট, ক্যালসিয়াম, আয়রন এবং মেট্রোনিডাজলের কথা জানান। এর বাইরে অল্প সংখ্যক উত্তরদাতা এমোক্সাসিলিন, প্যানিসিলিন, জেনসিয়ান ভায়োলেট সলিউশান, জেনশন ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেন।

কমিউনিটি ক্লিনিকে সেবাসংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করা হয়েছিল তারা ক্লিনিকে সেবা নিতে গিয়ে কোনো ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন কি না। শতকরা ২৩ শতাংশ অংশগ্রহণকারী হ্যাঁ সূচক উত্তর দিয়েছেন। বাকিরা কোনো ধরণের সমস্যার মধ্যে পড়েননি বলে জানান। সমস্যার সম্মুখীন হওয়া উত্তরদাতাদের মধ্যে শতকরা ৫০ শতাংশ অপর্যাপ্ত ঔষধ এবং সেবাপ্রদানকারীর অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করেছেন। কয়েকজন অংশগ্রহণকারী গর্ভবতী মায়েদের সুচিকিৎসার অভাব,

ওষুধ পেতে অতিরিক্ত অর্থপ্রদান, সেবাপ্রদানকারী-দেরঅসন্তোষজনক আচরণের কথা জানিয়েছেন।

ঔষধের প্রাপ্যতা এবং আনুষাঙ্গিক সীমাবদ্ধতা

ব্যবস্থাপত্র মোতাবেক ঔষধ নিতে গিয়ে কোনো অসুবিধা-র সম্মুখীন হয়েছে কিনা প্রশ্ন করা হলে শতকরা ২৫ জন না-সূচক উত্তর দিয়েছেন। যারা হ্যাঁ-সূচক উত্তর দিয়েছেন তারা প্রয়োজনীয় ঔষধ সরবরাহের অভাব, ঔষধ প্রদানে সংশ্লিষ্ট কর্মীদের অনিচ্ছা, পরিমাণে কম ঔষধ দেয়া ইত্যাদি অসুবিধার কথা উল্লেখ করেছেন।

কমিউনিটি পরিচালনা কমিটির সদস্য থেকে পর্যাপ্ত ঔষধ সরবরাহ বিষয়ে উত্তরদাতাদের ৫৩ শতাংশই জানান ক্লিনিকে পর্যাপ্ত ঔষধপত্রের সরবরাহ নেই এবং ৪৬ শতাংশ জানান, ক্লিনিকে ঔষধের জন্য কোনো তহবিল নেই এবং অংশগ্রহণকারী সেবাপ্রদানকারীদের ৮০ শতাংশ জানান ক্লিনিকে দরিদ্র রোগীদের জন্য সমাজক-ল্যাণ তহবিলের ব্যবস্থা নেই। ৪০ শতাংশ কমিউনিটি পরিচালনা কমিটির সদস্য উত্তরদাতাদের মতে ক্লিনিকে ঔষধ আসে তিন মাস পরপর, ১৩ শতাংশ উত্তরদাতা বলেন ছয় মাস পরপর ক্লিনিকে ঔষধ আসে। উত্তরদাত-াদের ৮৬ শতাংশ জানান ঔষধ বিতরণ রেজিস্টার হালনাগাদ আছে। অংশগ্রহণকারী ৮০ শতাংশ সেবাপ্রদানকারী মনে করেন সকল রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি/উপকরণ নেই। সেবাপ্রদানকারীদের ৪০ শতাংশ বলেন ক্লিনিকে ঔষধের তহবিল নেই।

বাজেট সংক্রান্ত মতামত

প্রতিটি সক্রিয় কমিউনিটি ক্লিনিকে স্বাস্থ্য পরিচর্চা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গড়ে প্রতিবছর ১ লক্ষ ১১ হাজার ঔষধ সরবরাহ করা হয়। সাক্ষাতকারে কমিউনিটি ক্লিনিকের বাৎসরিক বরাদ্দ বিষয়ে ধারণা আছে কিনা এ বিষয়ে সেবাগ্রহীতাদের কাছে প্রশ্ন করা হয়। এদের ৯৭ শতাংশ জানান ক্লিনিকের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা নেই। কমিউনিটি পরিচালনা কমিটির সদস্যদের ৮০ শতাংশ মনে করেন আগত রোগীদের পর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা দিতে কমিউনিটি ক্লিনিকের বাজেটের পরিমাণ যথেষ্ঠ নয়। এই উত্তরদাতাদের ৩৪ শতাংশ মনে করেন বাজেটের পরিমাণ শতভাগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন এবং অন্য ৩৩ শতাংশ মনে করেন বাজেট অন্তত ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

পরিচালনা এবং জনঅংশগ্রহণ

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী সেবাগ্রহীতাদের কাছে ক্লিনি-কের পরিচালনা, নিরাপত্তা বিধান ও রক্ষণাবেক্ষণে কমিউনিটি গ্রুপের নিয়মিত সভার বিষয়ে জানতে চাইলে ৬৩ শতাংশ উত্তরদাতা এই বিষয়ে জানেন না বলে মন্তব্য করেন। এই না-সূচক উত্তরদাতাদের অধিকাংশই কমিউনিটি গ্রুপের অনিয়মিত সভার কারণ হিসেবে অব্যবস্থাপনা, দূর্বল পরিচালনা এবং সার্বিক-ভাবে সংশিষ্ট সদস্যদের অবহেলার কথা উলেখ করেন করেছেন। এই প্রশ্নের জবাবে কমিউনিটি পরিচালনা কমিটির অংশগ্রহণকারী সদস্যদের ৯২ শতাংশ বলেন কমিউনিটি গ্রুপের সভা প্রতি মাসে নিয়মিত হয়।

মাঠ পর্যায়ে সেবাগ্রহীতাদের একাংশের কাছে জানা যায় এই সভায় সাধরণ জনগণের মতামত রাখার সুযোগ থাকে না। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের নির্দিষ্ট

এলাকার জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরির কথা থাকলেও এই ধরণের উদ্যোগের কার্যকারিতার অভাব পরিলক্ষিত হয়েছে। অংশগ্রহণকারী এবং তাদের পরিবারের অনেক কিশোর কিশোরী বয়ঃসন্ধিকালীন সময়ে ক্লিনিক থেকে পরামর্শ ও সেবপ্রাপ্তির বিষয়ে জানেন না। জনগণের মধ্যে স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিতথ্য ও সচেতনতামূলক স্বাস্থ্য শিক্ষার প্রসারে কমিউনিটি ক্লিনিকগুলো ভূমিকা রাখতে পারেনি। বরাদ্দের অপ্রতু-লতা, অবকাঠামোগত সংকট, দক্ষ জনবলের অভাব, বিশেষ চাহিদা পূরণের সুযোগ না থাকা ইত্যাদি নানা কারণে কাঙ্খিত স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে কমিউনিটি ক্লিনিক এখনো পূর্ণ সক্ষমতা পায়নি।

নাগরিক সনদ ও অন্যান্য

প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকে সিটিজেন চার্টার থাকা বাধ্যতামূলক। এই নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ২৭ শতাংশ ক্লিনিকে চিটিজেন চার্টার নেই কিংবা জানেন না বলে জানিয়েছেন। এতে করে অনেক সেবাগ্রহণকারী বিপাকে পড়েছেন এবং অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। এক্ষেত্রে সাহায্য পেতে গিয়ে ক্লিনিকে সেবাপ্রদানকারী বা অসহযোগিতার কথা অনেকেই উল্লেখ করেছেন।

সেবার সার্বিক মান

কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে প্রাপ্ত সেবা নিয়ে সন্তুষ্ট কিনা এই প্রশ্ন করা হলে সেবাগ্রহীতাদের ৩২.৩ শতাংশ জানান তারা ক্লিনিকের সেবার মান নিয়ে সন্তুষ্ট নন।

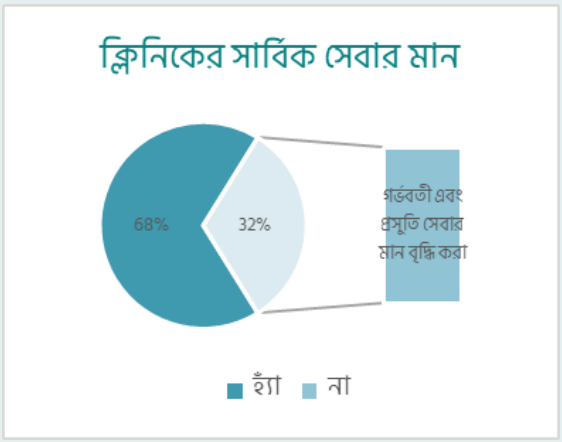

এদের অশিকাংশই কমিউনিটি ক্লিনিকে গর্ভবতী এবং প্রসূতি সেবার মান বৃদ্ধি করার কথা বলেন। সেই সাথে অবকাঠামোগত সীমাবদ্ধতার বিষয়টি উল্লেখ করে তারা বলেন যেহেতু প্রান্তিক জনগণের জন্য সেবা পেতে দূরে যাওয়ার সুযোগ সুবিধা কম, সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রে এই ক্লিনিকগুলোতে বর্তমান সুযোগ সুবিধা এবং নতুন সেবার সুযোগ তৈরি করতে হবে। একইসাথে, ক্লিনিকে সেবাদানের দৈনিক সময়সীমা খুবই কম, এই সময় আরো বৃদ্ধি করা উচিত এবং সেবাপ্রদানকারীদের উপস্থিতিও নিশ্চিত করতে হবে। সেবাগ্রহণকারী উত্তরদাতাদের মধ্যে ৬৭.৭% ক্লিনিকে সেবা নিয়ে তাদের সন্তুষ্টির কথা জানিয়েছেন।

অন্যদিকে কমিউনিটি পরিচালনা গ্রুপের ৬৩ শতাংশ মনে করেন ক্লিনিকের সেবার মান যথাযথ এবং পরিবেশবা-ন্ধব। বাকি ৩৭ শতাংশ মনে করেন ক্লিনিকের সেবা মানসম্মত না। কারণ হিসেবে তারা যোগাযোগ অব্যবস্থাপনা, ঔষধের বরাদ্দ কম ইত্যাদি বিষয়ে উল্লেখ করেন। কমিটি থেকে সামাজিক নিরীক্ষায় অংশগ্রহণক-ারীদের ৩০ শতাংশ মনে করেন সেবাগ্রহীতা এবং সেবাপ্রদানকারী উভয়ের আচরণই সন্তোষজনক নয়।

সুপারিশ

১. প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার পরিধি বৃদ্ধি করতে হবে এবং জরুরি ও গুরুতর রোগের চিকিৎসাসেবা প্রাপ্তির সুযোগ সৃষ্টি করা।

২. গর্ভবতী, প্রসূতি এবং নবজাতকের জন্য কমিউনি-টিভিত্তিক সেবাচাহিদা পর্যালোচনা করে সেবার মান এবং পরিসর বৃদ্ধি করা।

৩. সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির মাধ্যমে ক্লিনিক ব্যবস্থাপনাকে কার্যকরভাবে গড়ে তুলতে কার্যক্রম জোরদার করা।

৪. কমিউনিটি ক্লিনিকভিত্তিক বাৎসরিক সেবাপরিকল্পনা তৈরি করা, এবং সেবাগ্রহিতাদের অংশগ্রহণে বাৎসরিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা।

৫. ভৌগলিক অঞ্চল ভেদে রোগবালাইয়ের ভিন্নতা থাকে, তাই ক্লিনিকের সেবা অঞ্চলভেদে স্বতন্ত্র করতে হবে, এবং বাজেট প্রদানের ক্ষেত্রে কেন্দ্রমুখী সাধারণ বরাদ্দের পরিবর্তে কমিউনিটির চাহিদা-ভিত্তিক ভর্তুকি বরাদ্দ প্রদান করা।

৬. কমিউনিটি ক্লিনিকের বরাদ্দকৃত বাজেটের যথার্থতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৭. কমিউনিটি ক্লিনিকের বরাদ্দকৃত সেবাপ্রদানের সময় ছয় ঘন্টার কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে এবং সেবাপ্রদানের সময় বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. সার্বিক পর্যবেক্ষণ ও তত্ত্বাবধানে কমিউনিটি ক্লিনিক ব্যবস্থাপনা কমিটি সহ প্রাসঙ্গিক সরকারি প্রতিষ্ঠানের তৎপরতা বৃদ্ধি করা।

৯. অপ্রতুল ঔষধ সরবরাহ ব্যবস্থার সমাধান করে পর্যাপ্ত ঔষধ এবং চিকিৎসা সেবা সরঞ্জামের সরবরাহ এবং ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১০. সেবা প্রদানকারীদের আরো প্রশিক্ষিত ও দক্ষ করে গড়ে তুলতে বিভিন্ন দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা।

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রম : কতোটা পেল নিম্ন-আয়ের মানুষ

বৈশ্বিক মহামারী কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবের কারণে বাংলাদেশ বিশাল চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। বাংলাদেশে ২০১৯ সালের ৮ মার্চ প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী শনাক্ত করা হয়। ২৬ মার্চ ২০২০ সালে বাংলাদেশ প্রথম লকডাউন ঘোষণা করে যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয় এবং ২০২১ সালের ৫ এপ্রিল থেকে দেশে দ্বিতীয় বারের মতো লকডাউন শুরু হয়। 'লকডাউন' বা বিধিনিষেধ ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে দেশের অর্থনীতি চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। বিশেষ করে এই সময়ে স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবন ও জীবিকা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। পিপিআরসি এবং বিআইজিডি-এর এক গবেষণা অনুসারে, ২০২০ এর ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিলের মধ্যে গ্রামীণ মানুষের দৈনিক আয় ৭৯ শতাংশ এবং শহুরে দরিদ্রদের মধ্যে ৮২ শতাংশ কমেছে। শহুরে দরিদ্রদের খাদ্য বাজেটে ৪৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে এবং গ্রামাঞ্চলের দরিদ্রদের মধ্যে এই হার ৩২ শতাংশ। ব্র্যাক প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে দেখানো হয়েছে, প্রায় ৩৬ শতাংশ নগরবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি হয়েছে এবং ৩ শতাংশ শ্রমজীবী কোনো বেতন পাননি। ব্র্যাক পরিচালিত আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, ৯৫ শতাংশ পরিবারের আয় কমে গিয়েছে এবং ৬২ শতাংশ বেতনভুক্ত কর্মচারীকে তাদের চাকরি থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। সরকারি হিসাবে করোনার প্রভাবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার ২৯ দশমিক ৫ শতাংশে উন্নীত হয়, যা ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ২০ দশমিক ৫ শতাংশ ছিলো। অর্থাৎ এক বছরে নয় শতাংশ (প্রায় ৪৫ লক্ষ) মানুষ নতুন করে দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। তবে সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)-এর গবেষণা মতে, করোনার প্রভাবে আয় কমে যাওয়ায় সার্বিকভাবে দারিদ্র্যের হার ৩৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। পিপিআরসি ও বিআইজিডি'র আরেকটি প্রতিবেদন বলছে, করোনাভাইরাসের সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে দ্বিতীয় দফায় সরকারি বিধিনিষেধ আরোপের ফলে দেশে নতুন করে ৩ দশমিক ২ কোটি মানুষ দরিদ্র হয়েছে।

মহামারীর প্রভাবের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক, উদ্যোক্তা, শিল্প প্রতিষ্ঠান, দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় সরকার কর্তৃক বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়। করোনার ভয়ংকর প্রভাবের সাথে সাথে এ বছর ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধের ফলে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক বাজারে অস্থিতিশীলতা, ক্রমবর্ধমান মুল্যস্ফীতির মতো নানা

কারণে বাংলাদেশের অর্থনীতির ওপর চাপ তৈরি হয়েছে। অতীত থেকে চলমান বাজার অব্যবস্থাপনা, দুর্বল মনিটরিং, অসাধু ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট ইত্যাদি কারণে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধির সংস্কৃতি তো রয়েছেই। করোনা মহামারীর প্রভাব এবং আন্তর্জাতিক অস্থিতিশীলতায় মানুষের আয় কমেছে, একইসাথে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি কারণে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার টিসিবি এর মাধ্যমে নিম্নআয়ের মানুষের কাছে সাশ্রয়ী/ন্যায্য মূল্যে পণ্য বিক্রয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি) বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন একটি স্বায়ত্তশাসিত রাষ্ট্রীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান। নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের আপদকালীন মজুদ এবং জনসাধারণের কাছে সাশ্রয়ী মূল্যে পণ্য সরবরাহ করার মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য স্থিতিশীল রাখা টিসিবির উদ্দেশ্য।

২০ মার্চ,২০২২ থেকে রমজান মাসকে সামনে রেখে সরকার "এক কোটি পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে 'টিসিবি পণ্য সরবরাহ কার্যক্রম" চালু করে। মূলত এক কোটি পরিবারের তালিকা দুইটি পর্যায়ে প্রণীত হয়–

১. করোনাকালে নগদ অর্থ সহায়তা পাওয়া প্রথমে ৩৫ লাখ এবং পরবর্তীতে সড়ক পরিবহন, নৌ পরিবহন শ্রমিক, নন-এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আরো সাড়ে তিন লাখ সহ মোট ৩৮ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবার।
২. জনসংখ্যা ও দারিদ্র্যের সূচকের ভিত্তিতে জেলা ও উপজেলার উপকারকারভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ করে প্রণীত নতুন করে ৬১ লক্ষ ৫০ হাজার পরিবার।

এক কোটি পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে 'টিসিবি পণ্য সরবরাহ কার্যক্রমে রমজান মাসে মূল্য বৃদ্ধি হয় এমন চারটি পণ্য বিক্রয় করা হয়। প্রথম ধাপে এক কোটি পরিবারের কাছে ১১০ টাকা লিটার দরে বিক্রি করা হয় দুই লিটার করে সয়াবিন তেল। এ ছাড়া ৫৫ টাকা কেজি দরে দুই কেজি করে চিনি, ৩০ টাকা কেজি দরে পাঁচ কেজি করে পেঁয়াজ এবং ৬৫ টাকা কেজি দরে দুই কেজি করে মসুর ডাল বিক্রি করা হয়। দ্বিতীয় ধাপে এসব পণ্যের সঙ্গে যুক্ত হয় প্রতি কেজি ৫০ টাকা দরে দুই কেজি করে ছোলা। এতে সরকার প্রায় ৪৫০ কোটি টাকা ভর্তুকি প্রদান করে। বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২ কিস্তিতে ১ কোটি পরিবারের কাছে টিসিবির পণ্য বিক্রি করা হয়। প্রথম কিস্তি ২০-৩০ মার্চ এবং দ্বিতীয় কিস্তি ৩ থেকে ২০ এপ্রিল সম্পন্ন করা হয়।

ফ্যামিলি কার্ড কার্যক্রমের সামাজিক নিরীক্ষার যৌক্তিকতা

এই ফ্যামিলি কার্ড কর্মসুচি শুরু হবার পর থেকে উপকারভোগীদের তালিকা প্রণয়ন, অন্তর্ভুক্তি, বিক্রয়ে অনিয়ম, হয়রানি ইত্যাদি বিষয় গণমাধ্যম ও সামাজিক মাধ্যমে বারবার আলোচনায় এসেছে। দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সহায়তায় গৃহীত এই উদ্যোগের ব্যয়ের যথার্থতা, উপযোগিতা, পরিষেবা প্রদান, স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতার চ্যালেঞ্জগুলো চিহ্নিকরণে এই সামাজিক নিরীক্ষার যৌক্তিকতা অন্তর্নিহিত।

এই সামাজিক নিরীক্ষাটি নোয়াখালী জেলায় পরিচালনা করা হয়। প্রায় ৩৪ লাখ মানুষের বসতির নোয়াখালী জেলায় দারিদ্র্যের হার ২৩.৩% (বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো)। এই জেলার অধিভুক্ত উপজেলাগুলোর মধ্যে সুবর্ণচর এবং হাতিয়া উপজেলার দারিদ্র্যের হার সর্বোচ্চ (প্রায় ৪৮%) এবং সোনাইমুড়ী উপজেলায় সর্বনিম্ন (৬.৮%)। এই কার্যক্রমে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন স্থানীয় প্রতিনিধিদের সহযোগীতায় ৯টি উপজেলা ও ৮টি পৌরসভায় টিসিবি'র পণ্য বিতরণ করা হয়। জেলা প্রশাসকের তথ্য মতে মোট ১ লাখ ৬৯ হাজার ৩২৫ জন তালিকাভুক্ত পরিবার টিসিবি সুবিধা পেয়েছে।

সামাজিক নিরীক্ষার উদ্দেশ্য ও কৌশল

সামাজিক নিরীক্ষা একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দুর্বলতা এবং সরকারি পরিষেবা এবং পরিষেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের সমন্বিত মতামত জানা যায়। সংশ্লিষ্ট সেবা প্রদানক-

ারীদের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সেবা প্রাপ্তি, টিসিবির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিল এবং পণ্যের পর্যাপ্ততা, সেবার কার্যকারিতা নিরীক্ষণ, সেবার মানবৃদ্ধিতে নীতি কৌশল প্রণয়নে সুপারিশ তৈরি এবং যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য তরুণদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে; যার মূল উদ্দেশ্য–

১. এক কোটি পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ড' প্রদানের মাধ্যমে 'টিসিবি পণ্য সরবরাহ কার্যক্রমে সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা;
২. নিম্ন আয়ের মানুষদের জন্য পরিচালিত এই কার্যক্রমের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা এবং এটিকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে জনপ্রস্তাবনা তৈরি করা।

১.৪ নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগলিক এলাকা এই সামাজিক নিরীক্ষাটি নোয়াখালী জেলার ৯টি ইউনিয়নে পরিচালিত হয়। সেবাগ্রহণকারী এবং প্রদানকারী নারী ও পুরুষ সদস্যরা নিরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন। নিরীক্ষাটি নোয়াখালীর কবিরহাট উপজেলার নরোত্তমপুর ও বাটইয়া ইউনিয়ন, সুবর্ণচর উপজেলার ধর্মপুর ও চরবাটা ইউনিয়ন এবং বেগমগঞ্জ উপজেলার একলাশপুর ইউনিয়নে পরিচালিত হয়।

উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

এই নিরীক্ষার জন্য বিভিন্ন উৎস উপকারভোগী, সেবা প্রদানকারী ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের কাছে থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহকে বর্ণনামূলক বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং তথ্যমূলক সারণি ও লেখচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস থেকে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই সামাজিক নিরীক্ষা প্রতিবেদন প্রণীত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য, প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার প্রকাশিত খবর, প্রতিবেদন যাচাই বাছাই ও পর্যালোচনালব্ধ তথ্য এখানে ব্যবহার করা হয়েছে। সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটারবেজড সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. সুবিধাভোগীদের সার্বিক চিত্র

২.১ সুবিধাভোগীদের জীবিকা ও পারিবারিক চিত্র:

এই সামাজিক নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ২২ শতাংশ নারী এবং শতকরা ৭৮ শতাংশ পুরুষ, যারা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত হয়ে জীবিকা নির্বাহ করেন এবং একটি বড় অংশ কৃষক, ক্ষুদ্রব্যবসায়ী, গৃহিনী ও দিনমজুর। সাধারণত পরিবারে উপার্জনক্ষম ব্যক্তির ওপর পুরো পরিবার নির্ভর করে। নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ৮৬% ব্যক্তির পরিবারের উপার্জনশীল সদস্য মাত্র একজন এবং শতকরা ১৪ শতাংশ পরিবার ব্যয় নির্বাহের জন্য পরিবারের দুইজন সদস্যের ওপর নির্ভরশীল।

চিত্র ০১: নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের পেশা

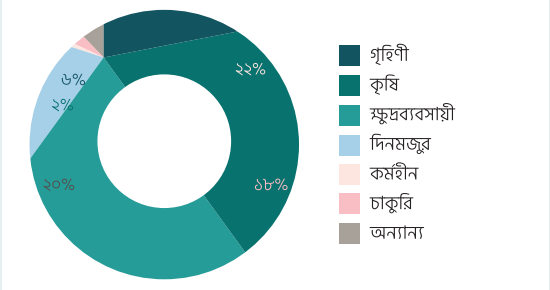

নিরীক্ষায় অংশ নেওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের ১ জন সদস্য আছে ১ টি, ২ জন আছে ২ টি, ৩ জন আছে ৪ টি পরিবারের। ৪ জন ও ৫ জন করে সদস্য আছে যথাক্রমে ৮ টি ও ১৫ টি পরিবারের এবং ৫ এর অধিক

চিত্র ০২ : পরিবারের সদস্য সংখ্যা ও মাসিক ব্যয় সম্পর্ক (টাকায়)

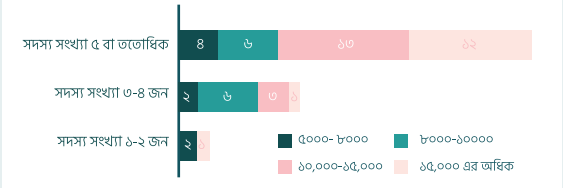

সদস্য আছে ২০ টি পরিবারের। পাশাপাশি ৮ টি পরিবারের মাসিক খরচ ৫ হাজার থেকে ৮ হাজার টাকার মধ্যে এবং ৮ হাজার টাকা থেকে ১০ হাজার টাকার মধ্যে মাসিক খরচ হয় ১৩ টি পরিবারের। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে শতকরা ৩২ শতাংশ পরিবারের মাসিক খরচ ১০ হাজার টাকা থেকে ১৫ হাজার টাকার মধ্যে এবং ১৫ হাজার টাকার বেশি মাসিক খরচ আছে ২৬% পরিবারের।

২.১ টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড প্রাপ্তি

বাণিজ্য মন্ত্রণালয় কতৃক টিসিবির'র নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য বিক্রি পরিকল্পনা ও কৌশল বাস্তবায়ন নির্দেশিকা -২" এর পরিপত্র অনুয়ায়ী স্থানীয় জনপ্রতিনিধিরা জনগনকে টিসিবি কার্ড সম্পর্কে অবহিত করার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী মধ্যে ৮ জন ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের থেকে এবং ৪২ জন ওয়ার্ড মেম্বার থেকে সংগ্রহ করেছেন। উক্ত কার্ড পেতে শতকরা ৯৪% অংশগ্রহণকারীকে নিজে গিয়ে তথ্য দিয়ে আসতে হয়েছে। ৪৪ জন ব্যক্তি স্বাচ্ছন্দে টিসিবি কার্ড নিতে পেরেছেন, এবং ৬ জন ব্যক্তি নানান অনাকাঙ্খিত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন, যার মধ্যে তদবির করতে না পারা, কার্ড দিতে কালক্ষেপন করা, বাড়তি খরচ, ইউনিয়ন পরিষদে ভালো ব্যবহার না পাওয়া ইত্যাদি কথা বলেছেন।

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী দুজনের মতে ৩টি পরিবারের একাধিক ব্যক্তি টিসিবি ফ্যামিলি কার্ড পেয়েছেন। শতকরা ১২ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর মতে কার্ড প্রদানের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিলোনা। তাদের মতে স্বজন প্রীতি, তথ্য সংগ্রহের জটিল প্রক্রিয়া, উপযুক্ত মানুষকে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত না করা এসব কারণে কার্ড প্রদান প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ ছিলো।

তবে ৫ টি ইউনিয়নের টিসিবি পণ্যের কার্ড বিতরণের দায়িত্ব প্রাপ্তদের তথ্যমতে প্রতিটি ইউনিয়নেই টিসিবি কার্ডের চাহিদার তুলনায় কম বন্টন করা হয়েছে, যেমন প্রথম ইউনিয়নে ১৮০০ টিসিবি কার্ডের চাহিদা থাকা স্বত্তেও মাত্র ১২০০ টিসিবি কার্ড বিতরণ করা হয়েছে। ৫টি ইউনিয়নে মোট চাহিদার শতকরা ৬২ জন টিসিবি কার্ড পাননি। সুবিধাভোগী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদ জানিয়েছে, নিরীক্ষা কার্যক্রম চালানো ৫ টি ইউনিয়নের মধ্যে ৩ টি ইউনিয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর তালিকা রয়েছে। যাদের তালিকা নেই সেসব ইউনিয়নে স্থানীয় জন প্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবগের্র সাথে আলোচনা করে তালিকা প্রস্তত করা হয়েছে।

২.২ টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ড সেবাগ্রহণ:

এক কোটি পরিবারের জন্য ফ্যামিলি কার্ডের আওতায় টিসিবি'র পণ্য দু'বার ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করা হয়। নিরীক্ষার ফলাফল অনুয়ায়ী শতকরা ৩৪% অংশগ্রহণকারী ১ বার এবং ৬৬ শতাংশ ২ বার করে ভর্তুকি মুল্যে পণ্য ক্রয় করেন।

ফলাফল বিশ্লেষণ করে আরো দেখা যায়, অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ২ বার টিসিবি'র পণ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পেরেছেন ৬৬% এবং ১ বার এই সুবিধাভোগ করেছেন ৩৪ শতাংশ। সরকার দুই ধাপে এই কার্যক্রম পরিচালনায় প্রথম ধাপে সয়াবিন তেল, চিনি, মসুর ডাল, পেঁয়াজ ভর্তুকি মূল্যে বিক্রি করে। বিক্রির সুবিধার্থে অধিকাংশ স্থানেই কয়েকটি পণ্য একসাথে একটি প্যাকেজ আকারে করা হয়। নিরীক্ষা কার্যক্রম চালানো সব ইউনিয়নগুলোতে প্রথম ধাপে একই প্যাকেজ বিক্রি করা হয়। সয়াবিন তেল ২ কেজি, চিনি ২ কেজি, মসুর ডাল ২ কেজি এই প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তবে এই প্যাকেজে পেঁয়াজ না থাকায় ভোক্তাদের বাজার দামেই তা সংগ্রহ করতে হয়। অন্যদিকে কারো কারো ক্ষেত্রে প্যাকেজের অন্তর্ভুক্ত সকল পণ্য প্রয়োজন না থাকলেও প্যাকেজ থাকায় তা কিনতে

চিত্র ০৩: কার্ড দিয়ে কতবার পণ্য পেয়েছেন?

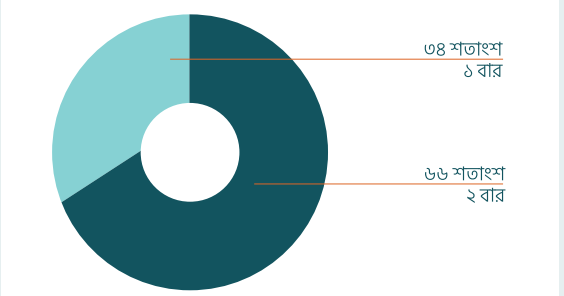

বাধ্য হয়েছেন, অর্থাৎ নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের সুযোগ ভোক্তার হাতে ছিলো না। জরিপে

অংশগ্রহণকারী ৭৪ শতাংশের মতে পণ্য বিক্রির স্থানে মূল্য তালিকা টাঙানো ছিলো, যা সেবা প্রদানে স্বচ্ছতার একটি বড় সূচক। ২য় দফা পণ্য বিক্রিতে রমজানের প্রয়োজনীয় নিত্য পণ্যসামগ্রী যুক্ত করা হয়। এই ধাপে নতুন করে ছোলা ও খেজুর যোগ করা হয়। সরকার নির্ধারিত ছোলার মুল্য প্রতি কেজি ৫০ টাকা এবং খেজুর কেজি প্রতি ৮০ টাকা। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে রমজান মাসে ছোলা পেয়েছেন ৩২ জন এবং খেজুর পেয়েছেন ৩ জন। (চিত্রঃ ৫)

নির্ধারিত মূল্যে ছোলাসহ প্যাকেজের দাম ৫৬০ টাকা এবং ছোলা- খেজুরসহ প্যাকেজের মুল্য ৬৪০ টাকা। নিরীক্ষায় অংশ নেওয়া কয়েকজন ছোলা- খেজুরসহ

চিত্র ০৫:
রমজান প্যাকেজে অংশগ্রহণকারী কতজন কি কি পণ্য পেয়েছেন।

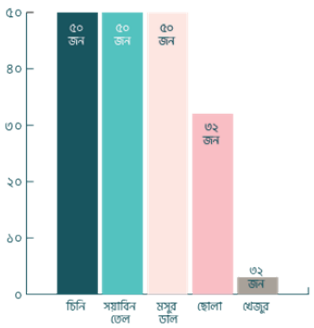

প্যাকেজটি বাড়তি মুল্যে ৬৮০ টাকায় কিনতে হয়েছে। নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের একটি অংশ এই পণ্যের মান ও পরিমাণ নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

২.৩ পণ্য চাহিদা, মূল্য এবং প্রাপ্তি

নিরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৬০% ব্যক্তি পণ্য গ্রহণের পর নীতিমালা অনুয়ায়ী তাদেরকে 'বুঝিয়া পাইলাম' মর্মে স্বাক্ষর করতে বলা হয়েছে বলে জানান। সরকার যে প্যাকেজ অনুয়ায়ী পণ্য সরবরাহ করছে তাতে প্রায় ৭০ শতাংশ ভোক্তা নিজের প্রয়োজন অনুয়ায়ী পণ্য ক্রয় করতে ব্যর্থ হয়েছেন। প্যাকেজের পণ্যের ধরণ ও মূল্য নির্ধারণে সম্ভাব্য উপকারভোগীদের অংশগ্রহণ না থাকার কারণে কোনো কোনো উপকারভোগী বলেছেন প্যাকেজের কিছু পণ্য তার জন্য অপ্রয়োজনীয়, এমনকি কেউ কেউ বলেছেন বাজারের তুলনায় সাশ্রয়ীও নয়। কেউ কেউ ফ্যামিলি কার্ড পেলেও সময়মতো টাকা জোগাড় করতে না পারার কারণে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে।

২.৪ টিসিবি পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব

টিসিবি'র পণ্য বিক্রয় কেন্দ্র থেকে অংশগ্রহণকারী শতকরা ৫২ শতাংশ ব্যক্তির বাড়ির দূরত্ব ১ কিলোমিটার থেকে ৩ কিলোমিটারের মধ্যে ছিলো এবং অন্যদের বাড়ির দূরত্ব ৩ থেকে ৫ কিলোমিটারের মধ্যে ছিলো; যার জন্য সুবিধাভোগীদেরকে প্রতিবার পণ্য

চিত্র ০৭: টিসিবি পণ্য বিক্রয় কেন্দ্রের দূরত্ব

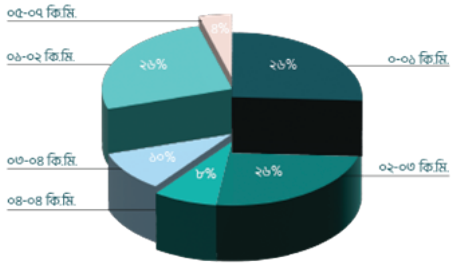

ক্রয় করতে গড়ে ২৭ টাকা যাতায়াত খরচ বহন করতে হয়েছে। এছাড়াও পণ্য কিনতে লাইনে দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করার কারণে কোনো কোনো উপকারভোগীদের দৈনিক উপার্জন বাধাগ্রস্ত হয়েছে। ২১ জন অংশগ্রহণকারীর তথ্যমতে তাদের ইউনিয়নে ১ টি করে টিসিবি পণ্য বিক্রয়কেন্দ্র রয়েছে। ২ টি করে বিক্রয়কেন্দ্রের কথা জানেন ২০ জন ব্যক্তি। জরিপে অংশ নেওয়া ৮ জনের জানামতে তাদের ইউনিয়নের টিসিবি বিক্রয়কেন্দ্র আছে ৮ টি।

২.৫ টিসিবি কার্ড প্রাপ্তিতে অনিয়ম

এই নিরীক্ষায় অংশ নেওয়া ৫০ জনের মধ্যে ৫ জন ব্যক্তির জানামতে ৭ টি পরিবারের কার্ড থাকা সত্ত্বেও তারা পণ্য পাননি। এবং শতকরা ৪২ জন ব্যক্তি মনে করেন প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও অনেক পরিবার টিসিবি কার্ড পায়নি। তাদের জানামতে গড়ে ৩-৪ টি পরিবার এই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন।

সরকারের দেওয়া অন্যান্য কার্ডের সুবিধা ভোগ করেন শতকরা ১৪ জন অংশগ্রহণকারী এবং শুধু টিসিবি'র পণ্য সুবিধা ভোগ করেন ৮৬% ব্যক্তি।

২.৬ খাদ্য নিরাপত্তায় ফ্যামিলি কার্ড সেবার ভূমিকা

টিসিবি'র ফ্যামিলি কার্ডের এই প্যাকেজ পণ্য স্বল্প আয়ের মানুষের বাস্তবিক অর্থে কোনো উপকারে আসছে কিনা তা জানতে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার ওপর এর প্রভাব আলোচনা করা হয়। নিরীক্ষায় অংশ নেওয়া ২৪ জনের মতে এই প্যাকেজ তাদের মোট পরিবারের প্রয়োজনের ১০% চাহিদা পূরণ করেছে। চাহিদার ২০% পূরণ হয়েছে বলে মনে করেন ২৩ জন অংশগ্রহণকারী। (চিত্রঃ ০৮) ক্রয়কৃত প্যাকেজ ৫-৮ দিনেই শেষ হয়ে যায় ৫৪ শতাংশ অংশগ্রহণকারীর, ৯-১২ দিনে প্যাকেজ শেষ হয় ২৮% পরিবারের এবং শতকরা ১৮ পরিবারের পণ্যসামগ্রী ১৩ থেকে ১৬ দিনের মধ্যে শেষ হয়েছে।

তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী

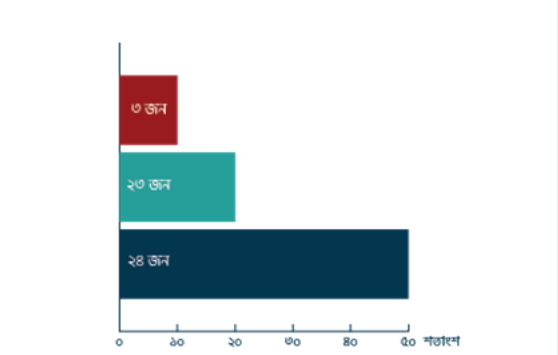

চিত্র ০৮: টিসিবি পণ্য ও খাদ্য নিরাপত্তা

কেউই পেঁয়াজ পাননি। টিসিবি এই ধরণের পণ্য বিক্রির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি অংশগ্রহণকারী পেঁয়াজের চাহিদা জানিয়েছেন। একই সাথে ১৮ জন ব্যক্তি আটা, ১৬ জন ব্যক্তি আলু, ১৯ জন রসুন, ১৩ জন চাল এসব পণ্য স্বল্প মূল্যে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

৩. পর্যালোচনা ও সুপারিশ

স্বল্প আয়ের জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সরকারের টিবিসির মাধ্যমে স্বল্পমূল্যে পণ্য বিক্রির উদ্যোগ একটি কার্যকরী পদক্ষেপ। নিরীক্ষার ফলাফল অনুয়ায়ী নোয়াখালী জেলার পাঁচটি ইউনিয়নের সুবিধাভোগীদের প্রায় এক-চতুর্থাংশ দারিদ্র্য সীমার নীচে অবস্থান করেন এবং পরিবারগুলোর সদস্য সংখ্যার সাথে মাসিক ব্যয়ের ধনাত্মক সম্পর্ক বিদ্যমান। সিংহভাগ সুবিধাভোগী টিসিবি কার্ড সম্বন্ধে স্থানীয় জন প্রতিনিধিদের থেকে জেনেছেন এবং কার্ড বিতরণের প্রক্রিয়া স্বচ্ছ ছিলো বলে মনে করেন। কিন্তু পণ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে বিপাকে পড়েছেন অনেকেই, হয় দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়াতে হয়েছে, কখনো কখনো পণ্য না কিনেই ফিরে আসতে হয়েছে। এক্ষেত্রে চাহিদা ও সরবরাহের সমন্বয় জরুরী। অপরপক্ষে টিসিবি'র দায়িত্ব প্রাপ্ত ব্যাক্তিরাও মনে করেন কার্ডের চাহিদা অনুযায়ী তারা পর্যাপ্ত কার্ড সরবরাহ করতে পারেননি। কারো মতে কার্ড থাকা সত্ত্বেও গ্রাহকদেরকে পণ্য না নিয়েই বাড়ি যেতে হয়েছে।

৩.১ সুপারিশ

নিরীক্ষার প্রাপ্ত সমস্যাগুলো বিশ্লেষণ করে নিম্নবর্ণিত পদক্ষেপগুলো গ্রহণের বিষয়ে সুপারিশ করা হলো-

- টিসিবি কার্ডের জন্য তালিকা প্রণয়নের ক্ষেত্রে জনগণের ভোগান্তি দূর করতে তথ্য প্রচারণাসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সঠিক তথ্যের জন্য ইউনিয়নভিত্তিক শুমারির ব্যবস্থা করতে হবে। প্রাথমিক তালিকা তৈরির পর স্থানীয় জনসাধারণের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে তালিকা চূড়ান্ত করতে হবে এবং তালিকায় নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, আদিবাসী, দলিতসহ প্রান্তিক ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে।

- মোট উপকারভোগীর তালিকা সংশ্লিষ্ট উপজেলা, ইউপি ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে

হবে এবং কার্ড প্রদানকারী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দায়িত্বপালন ও সেবা প্রদানে স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতা নিশ্চিতকরণে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

- টিসিবি কেন্দ্রের অবস্থান, তারিখ, সময় ইত্যাদি তথ্য সকল পর্যায়ে প্রচার করতে হবে এবং টিসিবি কেন্দ্রগুলোতে সরকার নির্ধারিত সব পণ্যের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।
- বিক্রয়কেন্দ্রের সংখ্যা বাড়াতে হবে এবং দূরত্বের ক্ষেত্রে যতটা সম্ভব লক্ষিত জনগোষ্ঠীর জন্য সহজে প্রবেশগম্য স্থান নিশ্চিত করতে হবে।
- কার্ডধারীদের জন্য নির্ধারিত পণ্যের সরবরাহ সুনিশ্চিত করতে হবে এবং উপকারভোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্য ক্রয়ের সুবিধা নিশ্চিত করতে হবে।
- আরো বেশি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে এই সেবার আওতায় আনতে টিসিবির জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সরবরাহ নিশ্চিত করা যার মধ্যে দিয়ে টিসিবি স্বাধীনভাবে পণ্য ক্রয় ও ভোক্তা পর্যায়ে বিপণন কার্যক্রম পরিচালনা করতে সক্ষম হবে। একই সাথে পর্যাপ্ত জনবলের মাধ্যমে বিদ্যমান আর্থিক সক্ষমতার শতভাগ কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণের উদ্যোগ নিতে হবে।
- টিসিবির ট্রাকসেলের ক্ষেত্রে পণ্যের পরিমাণ নির্দিষ্ট থাকায় অনেককেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য ন্যায্যমূল্যে কিনতে শ্রম ঘন্টা নষ্ট করে লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। অনেকেই খালি হাতেও ফিরছেন। টিসিবি ট্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং ন্যায্যমূল্যের দোকান স্থাপনের মাধ্যমে এই শ্রমঘন্টা ব্যয়, যাত-যাত ভাড়া দিয়ে পণ্য সংগ্রহের বিড়ম্বনা এবং বিশৃংখলা রোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।
- একই পরিবারের একাধিক ব্যক্তি যাতে কার্ড না পায় এ বিষয়ে তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।

কৃষিসেচে সরকারি ব্যয় ও কৃষকের লাভ-ক্ষতি

কৃষকের উৎপাদিত ফসলের- বিশেষত: ধানের লাভজনক মূল্য নিশ্চিত করা একটি বড় ধরণের চ্যালেঞ্জ। কৃষি উপকরণের ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির কারণে এই চ্যালেঞ্জ দিনে দিনে আরো তীব্র হচ্ছে। ধান উৎপাদন উপকরণের খরচের সাথে কৃষকের নিজের পারিবারিক শ্রমের মূল্য যোগ করলে ধানচাষে কৃষকরা লাভের মুখ দেখেন না। বিশেষভাবে বর্গাচাষী-ভাগচাষীর জন্য এ সমস্যা বেশ প্রকট। বাংলাদেশের কৃষি প্রধানতঃ ক্ষুদ্রজোত (Small Holder) ও ভাগচাষ নির্ভর। ফলে বেশিরভাগ ধানচাষীই মওসুম আন্তে লোকসানের মধ্যে পড়েন। সেচ ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অন্যতম অপরিহার্য কৃষি উপকরণ এবং ব্যয়েরও অন্যতম প্রধান খাত।

বাংলাদেশ সরকারের ২০২০-২১ অর্থবছরের ঘোষিত বাজেটে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকার কৃষি ভর্তুকি দিয়েছে, যা মূলত সার ও সেচের জন্য ব্যবহার হয়েছে। সেচ বাবদ বিদ্যুৎ বিলের ওপর ২০ শতাংশ ভর্তুকি রয়েছে। সরকার বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএডিসি) এবং বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনা ও সেচ-সুবিধা প্রদান করছে। তাছাড়া বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড এবং পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড কর্তৃক সেচের জন্য এক ও তিন- ফেজ-এর বিদ্যুৎ সংযোগের অনুমোদন দেওয়ার মাধ্যমেও সেচ-সুবিধা সম্প্রসারিত হচ্ছে ।

ক্ষুদ্র সেচ নীতিমালা ২০১৭ এর আলোকে সেচযন্ত্রেও স্থান ও দূরত্ব নির্ধারণ, অনুমোদন, লাইসেন্স প্রদান ও বিরোধ মীমাংসার জন্য জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সেচ কমিটি রয়েছে। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার নেতৃত্বে উপজেলা সেচ কমিটি মাঠ পর্যায়ে সেচ নীতি বাস্তবায়নের দায়িত্বে রয়েছেন। অনুমোদন ব্যতীত কোনো নলকূপ বসানো হলে সেচ কমিটি সেচ যন্ত্রের মালিকের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

বাংলাদেশে সেচ প্রধানতঃ ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীল (৭৩.৯%)। সেচে রয়েছে ডিজেলচালিত যন্ত্রের প্রাধান্য, যা ৭৮.৪৫%। সেচের জন্য ডিজেলে ভর্তুকি নেই। ভর্তুকির সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সেচে বিদ্যুৎ/ সৌরচালিত যন্ত্রের ব্যবহার মাত্র এক-পঞ্চমাংশের মতো, শতকরা হিসাবে যা ২১.৫৫ শতাংশ।

সেচ-সুবিধা, সেচ-প্রযুক্তি ও সেচ-এলাকা সম্প্রসারণের জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে বিএডিসি কর্তৃক ১৮ টি সেচ প্রকল্প ও ১০ টি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা

হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ১৮টি সেচ-প্রকল্পের অনুকূলে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে বরাদ্দ ছিল ৬১১.৪৬ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ৫৯৬.৪৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৭.৫৫%। অপরদিকে ১০ টি সেচ-কর্মসূচির অনুকূলে রাজস্ব /পরিচালন বাজেটে বরাদ্দ ছিল ২৭.৪১ কোটি টাকা, ব্যয় হয়েছে ২৭.২৬ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯৯.৪৫%।

আলোচ্য বছরে বিএডিসি কর্তৃক ২৭,১০০ হেক্টর সেচ এলাকা সম্প্রসারণ, ৮৫০ কিলোমিটার খাল পুনঃখনন/ সংস্কার, ৭৯০ কিলোমিটার ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ সেচনালা স্থাপন, ০২টি রাবার ড্যাম নির্মাণ, ০১টি হাইড্রোলিক এলিভেটর ড্যাম নির্মাণ, ৮৪টি সৌরশক্তিচালিত সেচপাম্প স্থাপন, ২৫০টি সেচপাম্প ক্ষেত্রায়ন, ৪৩৩টি সেচযন্ত্র বিদ্যুতায়ন, ৪১৩টি সেচ অবকাঠামো নির্মাণ, ৩৫টি সৌরশক্তিচালিত ডাগওয়েল স্থাপন, ৩৫টি ড্রিপ ইরিগেশন প্রদর্শনী প্লট স্থাপন, ১১

লেখচিত্র ০১: সেচে বিদ্যুতচালিত যন্ত্রের ব্যবহার

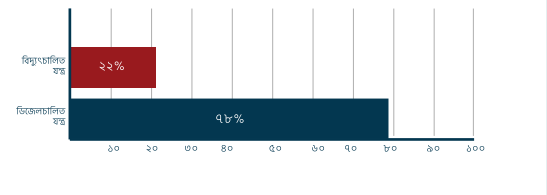

কি. মি. ফসল রক্ষা বাঁধ নির্মাণ করা হয়েছে। কৃষির উন্নয়ন ও ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএ) ১৯৮৫ সাল থেকে প্রাথমিকভাবে রাজশাহী, চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও নওগাঁ জেলায় সেচ কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের সকল জেলায় ভূউপরিস্থ ও ভূগর্ভস্থ পানির মাধ্যমে সেচ কার্যক্রম পরিচালনায় (বিএমডিএ) ভূমিকা রাখছে। বিএমডিএ কর্তৃক ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত ১৫ হাজার ৫৩৭টি সেচযন্ত্রের মাধ্যমে কৃষকদের মাঝে প্রায় ৫.১২ লক্ষ হেক্টর জমিতে সেচ সুবিধা প্রদান করেছে।

সেচ-সুবিধার অপর্যাপ্ততা এবং বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে তুলনামুলকভাবে ব্যয় কম হওয়ায় সারাদেশে অবৈধ সেচ-বাণিজ্যের এক দুষ্টচক্র গড়ে উঠেছে এবং এদের দ্বারাই সেচের পানি নিয়ন্ত্রিত হয়। কৃষকরা জিম্মি হয়ে আছে এদের কাছে; সাথে রয়েছে প্রশাসনিক অদক্ষতা ও দুর্নীতি। সেচের অযৌক্তিক মুল্যবৃদ্ধিজনিত কারণে ফসল উৎপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত বর্গাচাষ-ভাগচাষ নির্ভর। ভাগচাষে আধি পদ্ধতি প্রায় উঠে গেছে - বিশেষভাবে বোরো আবাদে। চুক্তি হিসেবে ভাগচাষীকে বিঘায় নির্ধারিত ৫/৬ মন ধানের বিনিময়ে চাষাবাদ করতে হচ্ছে। জমির মালিকের উৎপাদন ব্যয়ে কোনো দায় নেই - নেই কোনো উৎপাদন ঝুকি। ছোট-ভাগচাষীরা এ দুষ্টচক্র পরিচালিত অবৈধ সেচ-বাণিজ্যের প্রধান শিকার। ফলে সরকার এই খাতে ভর্তুকি দিলেও প্রকৃত কৃষকরা তার কোনো সুফল পায় কিনা সেই প্রশ্নই এখন বড় আকারে দেখা দিয়েছে। বিশেষত: সাম্প্রতিক সময়ে বিএমডিএ নিয়োগকৃত অপারেটরের স্বেচ্ছাচারিতায় সেচের পানি না পেয়ে দুই আদিবাসী সাওতাল কৃষকের বিষপানে আত্মহত্যা সেচ সমস্যার গভীরতা সকলের সামনে উন্মোচিত করেছে।

এই সমস্যাসমূহের মধ্যে রয়েছে -

- বিএমডিএ'র নিয়োগকৃত অপারেটরদের বেশির ভাগই ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী; এবং দলীয় পরিচয়ে অনেকেই অবৈধভাবে সেচ-বাণিজ্যের সাথে যুক্ত।
- সরকার বদলায় অপারেটরও বদলায়। ফলে নলকুপগুলো সব সময় ক্ষমতাসীন দলের জনপ্রতিনিধিদের কবজাতেই থাকে।
- অপারেটরের ইচ্ছায় কৃষকদের পানি মেলে। কৃষক নিজের কার্ড ব্যবহার করে সময়মতো পানি সেচ দিতে পারেন না, এমনকি সিরিয়ালও পাননা। অপারেটরের পেছনে ঘুরতে হয়; বারে বারে ধর্না দিতে হয়। কৃষককে নির্ধারিত সেচ-চার্জের চেয়ে অনেক বেশি দামে চুক্তিতে পানি কিনতে হয়।
- বিএমডিএ কর্তৃক চালুকৃত প্রি-পেইড কার্ডে ঘন্টাপ্রতি সেচ চার্জ ১১০ টাকা ধরা হলেও বাস্তবে নেওয়া হয় তার কয়েকগুণ বেশি। কৃষককে ব্যবহার করতে হয় অপারেটরের কার্ড। প্রতি বিঘায় সর্বোচ্চ সেচ-চার্জ হতে পারে ৬৯৯ টাকা;

সেখানে অপারেটররা এলাকাভেদে তা ১ হাজার ৮০০ টাকা থেকে ৩ হাজার টাকা এবং মেহেরপুরে বিঘা প্রতি ৫/৬ হাজার টাকা নেয়ার অভিযোগ রয়েছে।

- মাঠ-পর্যায়ে বিএমডিএ'র তদারকি নেই বললে চলে।
- সেচ বাবদ বিদ্যুৎ বিলের ওপর সেচ পাম্পের মালিকেরা ২০ শতাংশ ভর্তুকি পেলেও প্রান্তিক কৃষকেরা এর সুফল পাচ্ছেন না। নানা অজুহাতে সেচ-পাম্পের মালিকেরা সেচের খরচ বাড়িয়ে নিচ্ছেন।
- বিএডিসি'র কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ঘুষ-বাণিজ্য ও সেচ লাইসেন্স বাণিজ্যের অভিযোগ রয়েছে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে 'কৃষিসেচ সরকারি ব্যয় ও কৃষকের লাভ-ক্ষতি' শীর্ষক একটি ত্বরিত সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে সর্ব-উত্তরের জেলা নীলফামারীর ডোমার উপজেলার দুইটি ইউনিয়ন ভোগদাবুড়ি ও কেতকীবাড়িতে। দারিদ্র্য বিবেচনায় নীলফামারী জেলা উত্তরের দরিদ্রাক্রান্ত রংপুর বিভাগের অন্যতম জেলা। খানা আয়-ব্যয় জরিপ ২০১৬ অনুসারে দারিদ্র্যের উচ্চ ও নিম্নরেখা জাতীয়ভাবে যথাক্রমে ২৪.৩ ও ১২.৯ শতাংশ। দারিদ্র্যের এই হার রংপুর বিভাগে যথাক্রমে ৪৩.৩৪ ও ২৭.০ শতাংশ; যা নীলফামারীতে ৩২.৩ ও ১৪.২ শতাংশ। এ বিবেচনায় সমীক্ষার এলাকা নির্বাচন করা হয়েছে।

পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ তথ্যের ওপর ভিত্তি করে সমীক্ষাটি পরিচালিত হয়েছে এ বছরের এপ্রিল-মে মাসে, বোরো মওসুমে। বিভিন্ন জার্নালে প্রকাশিত প্রবন্ধ, সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরের নথি, বার্ষিক প্রতিবেদন পরোক্ষ তথ্যের উৎস হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষ তথ্য সংগ্রহের জন্য দুই-ইউনিয়নের কৃষক, সেচ কলের মালিক, বিএমডিএ নিয়োগকৃত অপারেটর ও স্থানীয় বিএমডিএর কর্মকর্তাদের একক ও দলীয় সাক্ষাৎকার ও কেসস্টোরি সংগ্রহ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২. সমীক্ষার ফলাফল

২.১ ভোগদাবুড়ি ও কেতকীবাড়ি কৃষি-কাঠামো

বোরো মওসুমে ভোগদাবুড়ি ও কেতকীবাড়ি ইউনিয়নের কৃষি প্রধানতঃ চুক্তিভিত্তিক ভাগচাষ নির্ভর। এদের মধ্যে বড় অংশ ভূমিহীন ভাগচাষী, যা প্রায় ৬৫%। ভাগচাষ এবং নিজের সামান্য জমি চাষ করেন এমন কৃষকের সংখ্যা প্রায় ২০%। আর অবশিষ্ট মাত্র ১৫% কৃষক নিজের জমি চাষ করেন। আমন মওসুমে চুক্তিভিত্তিক ভাগচাষের পরিমাণ কমে যায়। এই এলাকায় ভূমিহীন কৃষকের পরিমাণ এবং জমির মালিকানা গুটিকয়েক পরিবারের হাতে, তাই নিজস্ব-মালিকানায় চাষের আওতায় জমির পরিমাণ প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। বোরোতে যেহেতু পরিশ্রম এবং খরচ বেশি, তাই চুক্তিভিত্তিক ভাগচাষে জমির মালিকের সুবিধা বেশি। ভাগচাষী জমির মালিককে বিঘাপ্রতি জমি অনুযায়ী ৫ থেকে ৭ মন ধান দিতে হয়, এটা নির্ভর করে জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী। যে জমিতে উৎপাদন ব্যয় বেশি, সেচ ও সার খরচ বেশি তুলনামূলকভাবে সে জমিতে কম ধান দিতে হয়। ডিজেলনির্ভর সেচে খরচ বেশি, তাই বিঘা প্রতি ৪/৫ মণ ধান মালিককে দিতে হয়। বিদ্যুৎচালিত সেচে জমির মালিককে বিঘাপ্রতি হয় ৬-৭ মণ ধান দিতে হয়।

উৎপাদন ব্যয়ে জমির মালিকের কোনো দায় নেই - থাকে না কোনো উৎপাদন ঝুঁকিও। আমনে যেহেতু খরচ

লেখচিত্র ০২: কৃষিকাঠামো-চাষীর ধরণ

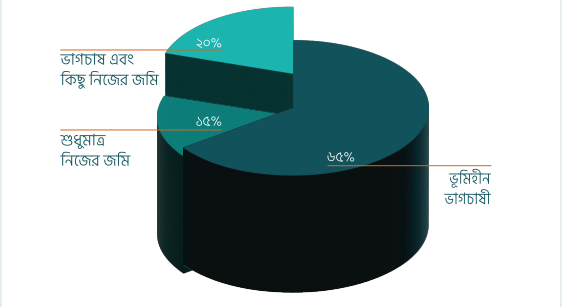

কম, তাই আধি-বর্গার পরিমাণ বেশি।

২.২ বিঘা-প্রতি কৃষকের উৎপাদন ব্যয়

এলাকাভেদে ও জমির বৈশিষ্ট্যের পার্থক্যের কারণে কৃষককের ফসল উৎপাদন ব্যয়ে তারতম্য ঘটে। কৃষি-শ্রমিকের দৈনিক মজুরি হার শ্রমিকের পর্যাপ্ততা ও ঘাটতির ওপর নির্ভর করে। মওসুমে এই এলাকা থেকে কৃষি-শ্রমিক অন্য এলাকায় স্থানীয়ভাবে স্বল্পকালীন অভিবাসন ঘটে -বিশেষভাবে নওগাঁ, সান্তাহারে এলাকার শ্রমিক ধান কাটতে চলে যায়। এই এলাকায় মজুরি হার সবচেয়ে কম।

কৃষিকাজে বর্তমানে চুক্তিভিত্তিক পিসরেটে 'বিঘাপ্রতি হিসাব' প্রায় সকল কাজ পরিচালিত হয়; দৈনিক মজুরির হিসাব নেই বললে চলে। জমি ভাড়ার খরচ / জমি মালিকের ভাগের অংশ বাদ রেখে বিঘাপ্রতি উৎপাদন খরচ বিদ্যুৎচালিত-সেচ সুবিধার ক্ষেত্রে প্রায় ১২ হাজার ৬শ ৯০ টাকা। এর মধ্যে শুরুতে আইল বাধা ৪শ, বীজ ২ কেজি ৬শ, ট্রাক্টর ৪ চাষ ১ হাজার ৪শ, চারা লাগানো ৮শ, সার ও কীটনাশক ২ হাজার ৩শ ৯০, নিড়ানো ১ হাজার ২শ, সেচ ২ হাজার, কর্তন ৩ হাজার ৫শ ও মাড়াই ৪শ । জমি বাবদ ভাগের অংশ ৬ মণ ধানের দাম ৪ হাজার ২শ খরচ হিসাবে যোগ করলে বিঘা প্রতি বোরোতে উৎপাদন খরচ বেড়ে দাঁড়ায় ১৬ হাজার ৮ শ ৯০ টাকায়। এই হিসাবে দৈনিক মজুরি ৪শ টাকা ধরা হয়েছে।

সাধারণতঃ বীজ, ট্রাক্টর ভাড়া সার, পানি ও মাড়ানি খরচ বাদ দিয়ে বাকি কাজ ভাগচাষী- কৃষকের পারিবারিক শ্রমেই সম্পন্ন করে, পারিবারিব শ্রমের হিসাব হয় না বলে মূলত: এটাই কৃষকের লাভ হিসেবে দেখে। এখানে বীজ, ট্রাক্টর ভাড়া, পানি ও মাড়ানি খরচ প্রায় নির্ধারিত। অন্যসব খরচ কম-বেশি হতে পারে। সার ও কীটনাশকের খরচ জমির বৈশিষ্ট্য ও কৃষকের ওপর নির্ভর করে । জমির ভাড়া বিঘাপ্রতি ৪ থেকে ৭ মণ। ডিজেলচালিত শ্যালো মেশিনে সেচ ব্যবস্থায় জমির ভাড়া ৪ অথবা ৫ মণ। ডিজেলচালিত শ্যালো মেশিনে সেচ খরচ বিঘাপ্রতি গড়ে খরচ ৫ হাজার ৩ শত ৮৮ টাকা হিসাবে মোট খরচ ১৯ হাজার ৫ শত ৭৮ টাকা।

জমির ভাড়া বাদ দিয়ে গড়ে বিঘা প্রতি কৃষকের উৎপাদন খরচ বারো হাজার টাকা। ধানের ফলন অনিশ্চিত, আবহাওয়ার ওপর নির্ভর করে। সে কারণে উপকরণ হিসেবে সার, কীটনাশক ও পানির মূল্য কৃষকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আবহাওয়া অনুকুল থাকলে বিঘাপ্রতি ২৫ থেকে ৩০ মণ ধানের ফলন হয়। চলতি বছর অসময়ে বৃষ্টি, শিলাবৃষ্টির কারণে ফলন ব্যাহত হয়েছে; বিঘাপ্রতি গড়ে ২০ থেকে ২৫ মণ ফলন হয়েছে। জমির মালিকের ভাগ দেয়ার পর কৃষকের লাভ তেমন হয় না; বাড়তি হিসেবে খড় পাওয়া যায়। এছাড়া ঘরে চাল থাকলে বছরের খাদ্যের নিশ্চয়তা থাকে। খাদ্য-নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় নিয়ে কৃষক লাভের বিষয়টি খুব একটা বিবেচনায় নেয় না।

যান্ত্রিকীকরণ, প্রযুক্তির ব্যবহার, চুক্তি-শ্রম কৃষিতে উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিকাজ সহজ হয়েছে; এতে ঝুঁকি বেড়েছে বর্গাচাষী/ভাগচাষীর। মালিক যে কোনো সময় ভাগচাষীকে জমি থেকে উৎখাত করতে পারেন। সে কারণে বিঘাপ্রতি জমি ভাড়া হিসাবে ধানের পরিমাণ নিয়ে কৃষকরা দরকষাকষি করতে সাহস পায় না।

২.৩ ভোগদাবুড়ি ও কেতকীবাড়ি ইউনিয়নে সেচ ব্যবস্থা

ভোগদাবুড়ি ও কেতকীবাড়ি ইউনিয়নে ৫ ধরণের সেচ ব্যবস্থা চালু রয়েছে-

ক. ডিজেল চালিত শ্যালো মেশিন
খ. বিদ্যুত চালিত অনুনোমোদিত সেচ কল
গ. বিদ্যুত চালিত অনুমোদিত সেচ কল
ঘ. বিএডিসি পরিচালিত সেচ প্রকল্প; ও
ঙ. বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিএমডিএ) পরিচালিত সেচ প্রকল্প

স্থানীয় কৃষকদের ভাষ্য অনুযায়ী অর্ধেকের বেশি জমিতে সেচ দেয়া হচ্ছে বিদ্যুত পরিচালিত পাম্পের সাহয্যে।

ক. ডিজেল চালিত শ্যালো মেশিন

ডিজেলচালিত সেচ কলে খরচ অনেক বেশি। প্রতি বিঘায় তেল (ডিজেল ও মবিল) বাবদ খরচ গড়ে ৪ হাজার টাকা। মেশিন ভাড়া বাবদ খরচ ১ হাজার থেকে

১ হাজার ২শ টাকা। এক বিঘায় খরচ পড়ে প্রায় ৫ হাজার ২ শ টাকা। ডিজেলচালিত শ্যালো মেশিন প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ। বিদ্যুৎ সুবিধা বিস্তৃত হওয়ায় শ্যালো মেশিনের সংখ্যা কমে আসছে। তবে বিদ্যুৎ পরিচালিত সেচকলের বিঘাপ্রতি মূল্য নির্ধারণে এর একটা ভূমিকা রয়েছে।

খ. বিদ্যুৎচালিত অনুনোমোদিত সেচ পাম্প

যেখানে সুযোগ রয়েছে কৃষক বাড়ির লাইন থেকে আশপাশের ৩/৪ বিঘা নিজের জমিতে অথবা অন্যের জমিতে সেচের পানি বিক্রি করে, বিঘাপ্রতি ২ হাজার টাকা হিসাবে। সেচের পরিমাণের ওপর বিল নির্ভর করে; বিঘাপ্রতি বিদ্যুৎ খরচ সর্বোচ্চ ১ হাজার টাকা। তবে এই বিদ্যুতের এই ধরণের ব্যবহার বেআইনী, তাই ধরা পড়লে ২ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা দিতে হয়। অনুমোদনের বিষয় অনেক কৃষক জানেনা; কৃষকের ভাষ্য অনুযায়ী "যেভাবে পার উৎপাদন কর, সেচের অনুমোদনের দরকার কি"।

গ. বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড বা পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অনুমোদিত সেচ কল

ভোগদাবুড়ি ও কেতকীবাড়ি ইউনিয়নে শুধুমাত্র পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের প্রায় ৮শ অনুমোদিত সেচ পাম্প রয়েছে। প্রতিটি সেচ পাম্প ৮ থেকে ৪০ বিঘা জমিতে পানি সেচ দিতে পারে। বিঘাপ্রতি বিদ্যুৎ খরচ সর্বোচ্চ ৮শ টাকা। সাধারণতঃ অবস্থাপন্ন কৃষক ও স্থানীয়ভাবে ব্যবসায়ীরা অনুমোদিত সেচ কলের মালিক। অনুমোদিত সেচ যন্ত্রে বিদ্যুৎ বিলে ২০ শতাংশ রিবেট রয়েছে। নিজের প্রয়োজনের বাইরে সেচ পাম্পের মালিক বাণিজ্যিকভিত্তিতে সেচের পানি বিঘাপ্রতি ২ হাজার টাকা হিসাবে বিক্রি করেন। কৃষকদের মতে অনুমোদিত সেচ কল তুলনামূকভাবে হয়রানি মুক্ত। সেচ বাণিজ্য সম্পর্কিত কোন তথ্য পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ডের স্থানীয় কার্যালয়ে নেই। সেচের মূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব উপজেলা সেচ কমিটির। বর্তমানে বিঘাপ্রতি সেচচার্জ জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ৮শ থেকে ১ হাজার ৫০০শ টাকা। সেচ কমিটির নির্ধারিত মূল্য এমনকি সেচ কমিটি সম্পর্কে কোন ধারণা স্থানীয় সেচ কল মালিকদের নেই। এই সম্পর্কিত কোনো তথ্য তারা কখনো শুনেননি।

ঘ. বিএডিসি পরিচালিত সেচ প্রকল্প

আলোচ্য দুইটি ইউনিয়নে বর্তমানে দুটি সেচ প্রকল্পের আওতায় গভীর নলকুপের মাধ্যমে কৃষক সেচ সুবিধা পাচ্ছে। প্রকল্প দু'টি হচ্ছে- "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" ও ইন্টিগ্রেটড এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আইএপিপি)। বিএডিসি বাস্তবায়িত সেচ প্রকল্পের আওতায় সেচকল বাৎসরিক ভাড়ার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়ে থাকে। বিএডিসি এ জন্য স্কিম ম্যানেজার নিয়োগ করে। বর্তমানে বাৎসরিক সেচকলের ভাড়া ২৩ হাজার পাঁচশত টাকা। নিয়ম অনুযায়ী জেলা/উপজেলা সেচ কমিটি নির্ধারিত সেচ-মূল্য অনুযায়ী স্কিম ম্যানেজার সেচকল পরিচালনা করবেন। বর্তমানে বিঘাপ্রতি সেচচার্জ ৮শ থেকে ১ হাজার ৫০০শ টাকা। জমির বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এ মূল্য নির্ধারণ হয়।

খাল পুনঃখনন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সেচ অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে ১৬ হাজার ১শ ৯৭ হেক্টর জমিতে ভূ-উপরিস্থ পানি নির্ভর সেচ সুবিধা সম্প্রসারণ করে প্রতি বছর প্রায় ৭২ হাজার ৮শ ৮৭ মেট্রিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন ও পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা তরান্বিতকরণ; পরিবেশবান্ধব নবায়নযোগ্য সৌরশক্তি ব্যবহার ও আধুনিক সেচ প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং কৃষকদের প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে সেচ দক্ষতা বৃদ্ধি ও ফলন পার্থক্য হ্রাসকরণ; এবং প্রকল্প এলাকায় আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ও দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্পটি" বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কেতকীবাড়িতে বাস্তবায়িত "রংপুর অঞ্চলে ভূ-উপরিস্থ পানি সংরক্ষণের মাধ্যমে ক্ষুদ্রসেচ উন্নয়ন ও সেচ দক্ষতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প" ২০১৯ সালে বাস্তবায়িত হয়েছে। স্থানীয় কৃষকদের কাছে ডিপ-কলের মালিক হিসেবে পরিচিত প্রকল্পের স্কিম ম্যানেজার এলাকার প্রভাবশালী বড় কৃষক। প্রকল্পাধীন এলাকায় বেশিরভাগ জমির মালিক তিনি নিজেই; ভাগচাষের মাধ্যমে তিনি চাষাবাদ করেন। সেচ-পানির নিয়ন্ত্রণ তার ক্ষমতা- কর্তৃত্ব আরো সুদৃঢ় করেছে।

স্কিম ম্যানেজার প্রকল্প বরাদ্দের পরিমাণ কতো টাকা তা জানেন না; এটি তাদের জানানো হয়নি। অনুমান করে বলেছেন প্রায় ২০ লাখ টাকা এবং প্রকল্প নকশা অনুযায়ী তা সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তাছাড়া প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিদেরও সম্পৃক্ত করা হয়নি। সেচ প্রকল্পে পানির মূল্য কিভাবে নির্ধারিত হবে এ সম্পর্কিত কোন তথ্য বিএডিসি থেকে জানানো হয় নাই; এ সম্পর্কিত কোন সভা স্থানীয় কৃষকদের সাথে বা পানি ব্যবহারকারিদের সাথে হয়নি। পানি ব্যবহারকারী দল (Water User Group) সম্পর্কে কোনো তথ্যও প্রদান করা হয়নি।

স্কিম ম্যানেজারের ভাষ্য অনুযায়ী, এই প্রকল্পের কার্যকারিতা এক-চতুর্থাংশ; ১শ ৫০ বিঘা পানি সেচের সুবিধা থাকলেও ৪০ বিঘার বেশি পানি সেচ দেয়া যাচ্ছে না। কৃষকরা পানি নিচ্ছেন না। পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড অনুমোদিত সেচ পাম্প থেকে পানি নিচ্ছে। অনেকেই ব্যক্তিগত সেচ পাম্প স্থাপন করেছেন। ট্রান্সফরমার চুরির কারণে বর্তমানে প্রকল্প থেকে পানি সরবরাহ বন্ধ আছে। প্রথম বছর বিঘাপ্রতি ১ হাজার ৫শ টাকা, ২য় বছর বিঘা প্রতি ১ হাজার ৮শ টাকা কৃষকদের কাছ থেকে সেচচার্জ নেয়া হয়েছে। সেচ কমিটির নাম শুনলেও সেচ কমিটি নির্ধারিত মূল্য সম্পর্কে স্কিম ম্যানেজারের ধারণা নেই।

জনগণের করের অর্থে স্থাপিত সরকারি ডিপ-টিউব ওয়েল দিয়ে কিভাবে সেচ বাণিজ্য হয়, সে বিষয়টি স্থানীয় কৃষকদের কাছে প্রায় অস্পষ্ট।

বিশ্বব্যাংকের ৪৬.৩১ মিলিয়ন ডলারের আর্থিক সহায়তার আওতায় বিএডিসি কর্তৃক বাস্তবায়িত ইন্টিগ্রেটড এগ্রিকালচার প্রোডাক্টিভিটি প্রজেক্ট (আই-এপিপি) প্রকল্প ২০০ ফুট মাটির নিচে পাইপ লাইন স্থাপনসহ গভীর নলকূপ স্থাপন করেছে প্রায় সাত বছর আগে। বর্তমানে বোগদাবুড়ি ইউনিয়নে এই প্রকল্পের দুটি নলকূপ থেকে বিঘাপ্রতি ২ হাজার টাকা সেচচার্জ হিসাবে স্থানীয় কৃষকরা বাণিজ্যিকভাবে সেচ সুবিধা পাচ্ছে। আমন মওসুমে ঘন্টায় সেচচার্জ ১৫০ টাকা। এখানে নলকুপের মালিকদের সাথে বর্তমানে বিএডিসি-সর কোনো প্রকার চুক্তি নেই; নলকূপ দুটি পরিচালিত হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায়। সেচ নীতিমালা অনুযায়ী ব্যক্তিগত মালিকানার আওতায় গভীর নলকূপের সাহায্যে সেচ-বাণিজ্যের সুযোগ নেই।

এ দুটি গভীর নলকূপের অপারেটর এলাকার বড় কৃষক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী। এরাই প্রকল্পাধীন এলাকায় বেশিরভাগ জমির মালিক। কৃষকরা চুক্তি-বর্গা/ভাগচাষের মাধ্যমে চাষাবাদ করছেন এবং সেচের পানি কিনছেন। সেচ কমিটি নির্ধারিত সেচের মূল্য সম্পর্কে নলকূপের মালিকদের কোন ধারণা নেই। প্রকল্পের নকশা অনুযায়ী "পানি ব্যবহারকারি দল" এর মাধ্যমে সেচ কাজ পরিচালিত হওয়ার কথা থাকলেও বর্তমানে এখানে পানি ব্যবহারকারী দলের কোনো অস্তিত্ব নেই। এই ডিপ-টিউবয়েলগুলো দিয়ে এখন ব্যক্তিগত মালিকানায় সেচ বাণিজ্য হচ্ছে।

৬. বিএমডিএ পরিচালিত সেচ প্রকল্প

কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বরেন্দ্র বহুমুখী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিএমডিএর) সেচ কার্যক্রম বর্তমানে রাজশাহী ও রংপুর বিভাগ জুড়ে বিস্তৃত। বিএমডিএ সেচের জন্য গভীর নলকূপ স্থাপন করে এবং সেগুলো চালানোর জন্য বাৎসরিকভিত্তিতে অপারেটর নিয়োগ দিয়ে থাকে। সেচের জন্য কৃষকদের প্রি-পেইড কার্ড প্রদান করে এবং বিদ্যুৎ খরচ বাবদ কৃষকদের কাছ থেকে ঘন্টাপ্রতি সেচচার্জ হিসাবে ১১০ টাকা কেটে নেয়ার কথা; এর মধ্যে অপারেটরের ভাতা অন্তর্ভুক্ত। ১৬ জেলায় বিএমডিএর রয়েছে ১৫ হাজার ৫শ ৩৭ টি সেচপাম্প রয়েছে। কৃষকদের সুবিধার জন্য সরকার সাশ্রয়ী মূল্যে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ ৪ টাকা ১৬ পয়সা দামে প্রদান করে। নীলফামারীর ডোমার ও ডিমলা উপজেলায় বিএমডিএ- এর ৯১ টি গভীর নলকুপ রয়েছে। তন্মধ্যে ডোমার উপজেলায় ৬৭ টি আর ডিমলায় রয়েছে ২৪টি রয়েছে।

বিএমডিএ-এর অপারেটর কারা?

ফোকাস গ্রুপ আলোচনায় জানা যায়, অপারেটররা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান এবং বেশি জমির মালিক। অপারেটররা অনেকেই নিজে নলকূপ পরিচালনা করেন না। সেচ-মওসুমে চুক্তিভিত্তিক লোক নিয়োগ দেন। অপারেটরদের অনেকেই আবার এলাকায় বাস

করেননা; সপরিবারে শহরে থাকেন। এই দায়িত্বটি তাদের জন্য বিনা পরিশ্রমে বাড়তি আয়ের উৎস হিসেবে কাজ করে।

মৃত ব্যক্তিও অপারেটর

বাৎসরিকভাবে অপারেটর নিয়োগ ও নবায়ন করার কথা থাকলেও অপারেট তালিকায় দেখা যায়, ৪ বছর আগে মৃত ব্যক্তিও অপারেটরের তালিকায় রয়েছেন। এতে বুঝা যায় বিএমডিএয়ের মাঠ পর্যায়ে কোনো তদারকি নেই।

প্রিপেইড কার্ড সম্পর্কে স্থানীয় কৃষকরা অবহিত নন

দুটো ইউনিয়নের কোনো কৃষক বিএমডিএয়ের প্রিপে-ইড কার্ড সম্পর্কে জানেন না; এমনকি স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদেরও এ ব্যাপরে ধারণা নেই। বিএ-মডিএ স্থানীয় কৃষকদের অবহিত করার ব্যাপারে কার্যকর কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করেছে বলে জানা যায়নি। এ ব্যাপরে একজন অপারেটরের ভাষ্য "এখানে কেউ কার্ড ছাড়ে নাই; কার্ড ছাড়লে ঝামেলা হবে; সকলে মাতব্বর হয়ে যাবে"। ফলে অপারেটররা ইচ্ছেমতো সেচ বাণিজ্য পরিচালনা করছে।

অকার্যকর প্রকল্প- পাবলিক মানি প্রাইভেট পকেট

অপারেটরের ভাষ্য অনুযায়ী, এ প্রকল্পের কার্যকারিতা এক-তৃতীয়াংশ। পানির দাম বেশি হওয়ায় কৃষক পানি নিতে আগ্রহী নয়। ফলে পল্লী-বিদ্যুতের লাইন নিয়ে কৃষকরা নিজেদের চাহিদা মতো পানি সেচ দিচ্ছে। এতে ডিপকলের লাভ কমে যাচ্ছে। অপারেটরের ম্যানেজারের ভাষ্য অনুযায়ী প্রতিটি ডিপে সরকারের খরচ হয় ২৬ লাখ টাকা, কিন্তু এই বিনিয়োগ কোনো কাজে লাগছে না।

সর্বোচ্চ বিল ৬৯৯ টাকা- কৃষককে পরিশোধ করতে হয় ২ হাজার টাকা

এফজিডিতে কৃষকরা অপারেটরকে ডিপ মালিক হিসেবে উল্লেখ করেন। অপারেটরা যে নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মী সেই বিষয়ে কৃষকদের ধারণা নেই। এতে করে অপারেটদের সেচ বাণিজ্যের বৈধতা তৈরি হয়। অনেক অপারেটর নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের নামে ৭/৮ টা কার্ড করে নেন এবং এর মাধ্যমে সেচ বাণিজ্য পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ দুটো কার্ড থাকলে একটা নলকুপ পরিচালনা করা যায়। এ ব্যাপরেও বিএমডিএর কোন তদারকি নেই। সেচ মওসুমে একজন কৃষকের সর্বোচ্চ ৬৯৯ টাকা সেচচার্জ হওয়ার কথা থাকলেও সেখানে অপারেটররা সাধার-ণতঃ ২ হাজার টাকা বিঘাপ্রতি আদায় করছেন। কোথাও কোথাও এর থেকেও বেশি নেয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারে বিএমডিএয়ের স্থানীয় কর্মকর্তাদের বক্তব্য-

"এখানে কিছু সমস্যা আছে। গরিব কৃষকের হাতে নগদ টাকা থাকেনা। ঘন্টায় চার্জ ১১০ টাকা। সেকারণে কৃষক ঘন্টা হিসাবে পানি নিতে চায় না; অপারেটরের ওপর নির্ভর করে। অপারেটর নিজের টাকায় কার্ডে টাকা ভরে। কৃষক ফসল তোলার পর অপারেটরের টাকা পরিশোধ করে। কৃষক যেভাবে খুশি থাকে, আমরা সেভাবে করি। সে সুযোগে হয়তো কিছু টাকা বেশি নেয়। তাছাড়া অপারে-টরেরও কিছু খরচ আছে - একটা লোক রাখতে হয়। যাকে আমরা ড্রেনম্যান বলি। কিন্তু সেটা যৌক্তিক হতে হবে। আপনি যেভাবে বলছেন, এ রকম হওয়ার কথা নয়। কৃষক এখন অনেক সচেতন। কেউ আমাদের অভিযোগ করেনি। অভিযোগ করলে আমরা নিশ্চয়ই দেখবো। তাছাড়া আমাদের জনবল ঘাটতিও রয়েছে। দুই উপজে-লায় মাত্র তিনজন কাজ করছেন। আমাদের কিছু ডিপটিউবওয়েল খুব ভালভাবে চলছে। সেখানে প্রায় সকল উপকারভোগীর কার্ড আছে। যেমন আশ্রম পাড়ায় একটি ডিপটিউবওয়েল রয়েছে।"

পর্যালোচনা ও সুপারিশ

৩.১ পর্যালোচনা

নীলফামারি জেলার ডোমার উপজেলার দুটো ইউনিয়ন কেতকীবাড়ি ও ভোগড়াবুড়ি ইউনিয়নে পরিচালিত সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে –

১. বিএডিসি এবং বিএমডিএয়ের সেচ প্রকল্প ডিজাইনে স্থানীয় কৃষক এবং সেচ-সুবিধা গ্রহণকারীদের অংশগ্রহণ কিভাবে হবে সে বিষয়টি গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করা হয়নি।

২. বিএডিসি এবং বিএমডিএ উভয় কর্তৃপক্ষের মাঠ পর্যায়ে কোনো প্রকার তদারকি নেই। উপজেলা পর্যায়ে গঠিত সেচ কমিটির কোন কার্যক্রম পরিলক্ষিত হয়নি। কৃষি-বাজেটের আওতায় সেচ প্রকল্পের প্রাসঙ্গিকতা ও কার্যকারিতা খুব দুর্বল।

৩. জনগণের করের অর্থে বাস্তবায়িত বিএডিসি এবং বিএমডিএ-এর সেচের নিয়ন্ত্রণ / মালিকানা স্থানীয় বৃহৎজমির মালিকদের হাতে যাওয়ায় ভাগচাষীদের দরকষাকষির ক্ষমতা হ্রাস পড়েছে। কৃষিবাজেট ভাগচাষীদের প্রান্তিকতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখছে।

৪. জনগণের করের অর্থে স্থাপিত সরকারি ডিপ টিউব ওয়েল দিয়ে ব্যক্তিগতভাবে সেচ বাণিজ্য হচ্ছে। সরকারি এই বিনিয়োগ থেকে ক্ষুদ্র-প্রান্তিক কৃষকরা লাভবান হচ্ছেন না।

৫. প্রকল্প বাস্তবায়নে স্থানীয় সরকার/ ইউনিয়ন পরিষদকে কোনভাবে সম্পৃক্ত করা হয়নি।

৬. ইউনিয়ন পর্যায়ে কৃষকদের পরামর্শ, সঠিক তথ্য জানানোর জন্য উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা রয়েছেন। দুটো ইউনিয়নে কৃষকরা তাকে চেনেন না: ফলে স্থানীয় কৃষকদের কাছে তার কাজের কোনো প্রকার জবাবদিহিতা নেই।

৭. সেচকলে বিদ্যুতের ওপর প্রদত্ত ভর্তুকির সুফল কৃষকরা পাচ্ছেন না।

৩.২ সুপারিশ

১. প্রতি মওসুমের শুরুতে বিএডিসি এবং বিএমডিএয়ের সেচ প্রকল্পের সুবিধাবলী, সেচ-কমিটি নির্ধারিত সেচ-চার্জ সম্পর্কে স্থানীয় কৃষকদের জানানোর জন্য মাইকিং করা

২. বিএডিসি এবং বিএমডিএয়ের কার্যক্রম স্থানীয় পর্যায়ে তদারকি জোরদার করতে হবে। এ দুই প্রতিষ্ঠানের কাজের সাথে উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তার কার্যক্রম সমন্বয় করতে হবে। কার্যক্রম তদারকিতে স্থানীয় কৃষক প্রতিনিধি ও ইউনিয়ন পরিষদকে সম্পৃক্ত করা।

৩. যিনি মাঠে থেকে সেচকল পরিচালনা করবেন তাকে সেচকলের পরিচালনার জন্য অপারেটর বা স্কিম-ম্যানেজার হিসাবে নিয়োগ করতে হবে। অনুপস্থিত অপারেটর এবং যারা লোক নিয়োগ করে সেচ কাজ পরিচালনা করছেন তাদের বাদ দিয়ে নতুনভাবে অপারেটর নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনে একাধিক ব্যক্তিকে অপারেটর নিয়োগ করা।

৪. বিএডিসি এবং বিএমডিএয়ের উদ্যোগে সেচ-পানি ব্যবহারকারী উপকারভোগীদের সভার আয়োজন করতে হবে। এ কাজে ইউনিয়ন পরিষদসহ উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে সম্পৃক্ত করা।

৫. কৃষকদের কাছ থেকে অতিরিক্ত সেচচার্জ নেয়া অবশ্যই বন্ধ করা।

৬. প্রত্যেক বর্গা/ভাগচাষীকে সেচচার্জ বাবদ বিঘাপ্রতি ৫শ টাকা ভর্তুকি হিসাবে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে নগদ সহায়তা প্রদান করা।

যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ : যুব উন্নয়নে সরকারি ব্যয় কতটা ভূমিকা রাখছে

ইউএনডিপি প্রকাশিত মানব উন্নয়ন প্রতিবেদন এশীয়-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের ৪৫টি দেশ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বাংলাদেশকে 'তরুণদের দেশ' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। তরুণরাই এখন দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ, মোট জনসংখ্যার ৩ ভাগের এক ভাগ, যা সংখ্যায় প্রায় ৫ কোটি ৩০ লাখ (২০১৮)। সংখ্যাতাত্ত্বিক এই বাস্তবতাকে 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট' বা 'জনমিতির সুফল' বলা হয়। এই বিশাল যুব সমাজকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে বেকার যুবকদের জন্য যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। বাংলাদেশের যুবসমাজকে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ করার লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর দেশব্যাপী কর্মপ্রত্যাশী যুবক ও যুবনারীদের জন্য স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)-এর লক্ষ্যমাত্রা ৮.৬ অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের কর্মমূখী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে আসছে। মাঠ পর্যায়ে ৬৩টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর শুরু থেকে মে ২০২১ পর্যন্ত মোট ৬৩ লাখ ৯১ হাজার ৭শ ৬৩ জন যুবকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে।

সম্পদের সীমাবদ্ধতা এবং কর্মসংস্থানের অভাবে অনেক বেকার যুবরা দারিদ্রের মধ্যে বসবাস করেন। যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য এই যুবকদের দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও সহজ শর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখা যাতে তারা দেশ ও জাতির অর্থনৈতিক উন্নয়নেও ভূমিকা রাখতে পারেন। এইসব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে যুবদের জন্য চলমান প্রশিক্ষণসমূহের নির্দিষ্টকৃত লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে-

১. বেকার যুবক ও যুবনারীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মমূখী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা; ২. যুবদের স্ব-কর্মসংস্থান সৃজনে উপযোগী করে গড়ে তোলা; ৩. বিশ্বায়নের সাথে সংগতি রেখে যুবদের দেশ-বিদেশের শ্রমবাজারের উপযোগী দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করা; এবং ৪. যুবদের মাঝে জ্ঞান, দক্ষতা ও দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন করা।

স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান ও আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে এই প্রশিক্ষণের আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক ট্রেডে আবাসিক ও অনাবাসিক ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য কোর্সগুলো হচ্ছে গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, মৎস্য চাষ, দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি উৎপাদন, বিপণন ও বাজারজাতকরণ, চিংড়ি ও কাঁকড়া চাষ, বিপণন ও বাজারজাতকরণ প্রশিক্ষণ, গবাদিপশুর প্রাথমিক চিকিৎসা প্রশিক্ষণ, মুরগি পালন ব্যবস্থাপনা, ও সমুদ্রগামী মৎস্যজীবীদের জন্য দায়িত্বশীল মৎস্য আহরণ প্রশিক্ষণ, মাশরুম ও মৌ-চাষ প্রশিক্ষণ কোর্স, লাইভস্টক এ্যাসিসটেন্ট প্রশিক্ষণ, প্রফেশনাল গ্রাফিক্স ডিজাইন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, পোশাক তৈরি প্রশিক্ষণ, ফ্যাশন ডিজাইন প্রশিক্ষণ, হস্তশিল্প (ব্যাগ তৈরি) প্রশিক্ষণ, ফ্রিল্যান্স/ আউটসোর্সিং ইত্যাদি।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থান তৈরিতে দেশব্যাপী যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রগুলোকে অর্থ বরাদ্দ দিচ্ছে সরকার। কিন্তু সঠিক ব্যবস্থাপনার অভাব, অনিয়ম, সদিচ্ছার অভাবে বরাদ্দকৃত অর্থ সঠিকভাবে ব্যয় হচ্ছেনা। যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সম্পর্কিত নানা অব্যবস্থাপনার খবর প্রায়শই গণমাধ্যমে দেখতে পাই। যুবদের আত্মকর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে পরিচালিত এই প্রশিক্ষণসমূহের লিপিবদ্ধ লক্ষ্য, প্রত্যাশা মাঠ পর্যায়ে কতটা ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করেছে, তরুণদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে তা কতটা সফল হয়েছে, জনপরিষেবা প্রতিষ্ঠান হিসেবে কতটা জনবান্ধব প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে, পাবলিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কতটা স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে পারছে অথবা কী কী সংকট আছে বলে তারা মনে করে ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধানের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের সেবার মানোন্নয়নের জন্য এই সামাজিক নিরীক্ষা পরিচালনা করা হয়।

সামাজিক নিরীক্ষার কৌশল ও উদ্দেশ্য

সামাজিক নিরীক্ষা একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার মাধ্যমে সেবা গ্রহণকারীদের সরাসরি অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারি সেবার পর্যাপ্ততা, মান, দুর্বলতা এবং সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে জনগণের সমন্বিত মতামত জানা যায়। সরকারের জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, তরুণদের প্রশিক্ষণ প্রাপ্তি, প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের পর্যাপ্ততা এবং কার্যকারিতা নিরীক্ষণ, সেবার মানবৃদ্ধিতে নীতি-কৌশল প্রণয়নে সুপারিশমালা তৈরি এবং যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য তৃণমূল তরুণদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে এই সামাজিক নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে যার মূল উদ্দেশ্য-

১. যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিরাজমান সম্পদের সীমাবদ্ধতা চিহ্নিত করা;
২. প্রায়োগিক ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের কার্যকারিতা বিশ্লেষণ করা;
৩. সেবা প্রতিষ্ঠানের সেবার মান উন্নীতকরণে অধিপরামর্শ করা;
৪. স্থানীয় জনগণের অধিকতর অংশগ্রহণের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে সুশাসন নিশ্চিত করা।

নিরীক্ষা কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ভৌগলিক এলাকা

এই সামাজিক নিরীক্ষার কাজে বাগেরহাট জেলার সদর উপজেলা উপজেলার বারাকপুর যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে নির্বাচিত করা হয়েছে। প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী এবং প্রদানকারী উভয় পক্ষের নারী ও পুরুষদের মধ্যে এই জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপে অংশগ্রহণকারীরা চিতলমারী, ফকিরহাট, বাগেরহাট সদর এবং রামপাল উপজেলার অধিবাসী।

সামাজিক নিরীক্ষার পদ্ধতি, উপাত্ত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ

তথ্য সংগ্রহের জন্য সাক্ষাতকার (আধো-কাঠামোবদ্ধ প্রশ্নোত্তর) পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ প্রাপ্যতা, প্রশিক্ষণের মান, সুযোগের পর্যাপ্ততা ইত্যাদি বিষয় গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করে প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা, সক্ষমতা, সংকট, সীমাবদ্ধতা ও কার্যকারিতা যাচাই করা হয়েছে। এই নিরীক্ষায় বিভিন্ন উৎস থেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে। সমন্বিত প্রতিবেদন প্রণয়নের লক্ষ্যে সকল প্রাথমিক তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটারবেজড সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীর ধরণ

এই নিরীক্ষা কার্যক্রমে ১০০ তরুণ প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। উত্তরদাতা তরুণদের মধ্যে ৪১ শতাংশ পুরুষ ও ৬৯ শতাংশ নারী।

নিরীক্ষাপ্রাপ্ত ফলাফল

প্রশিক্ষণ কোর্স সম্পর্কিত তথ্য

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তরুণরা বিভিন্ন কোর্সের মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ৪০ শতাংশ গবাদিপশু, হাঁস-মুরগি পালন, প্রাথমিক চিকিৎসা, মৎস্য চাষ ও কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ৯ শতাংশ টেইলরিং প্রশিক্ষণ, ১০ শতাংশ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ, ১৭ শতাংশ বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ ট্রেডে প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদের কেউ কেউ

দুই বা ততোধিক কোর্সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ৮৪ শতাংশ জানান তাদের প্রশিক্ষণের মেয়াদ ছিল ১ মাস। বাকিরা ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তিন মাস, এবং ছয়মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছেন।

ভর্তি ফি সম্পর্কিত

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণরা জানান প্রশিক্ষণের ভর্তির ফি বিষয়ক আলোচনায় ৫০ টাকা, ১শ টাকা, ২শ টাকা, ৩শ টাকা এবং ১ হাজার ১শ টাকা ফি দিয়ে বিভিন্ন প্রশিক্ষণে ভর্তির কথা জানিয়েছেন। এদের ২৪ শতাংশ তাদের ভর্তি রশিদে ফি উল্লেখ ছিলো না বলে জানিয়েছেন।

প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির উৎস

সামাজিক নিরীক্ষার অংশগ্রহণকারী তরুণদের প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য প্রাপ্তির উৎস সম্পর্কে তারা মাইকিং, লিফলেট, পোস্টার, সোশ্যাল মিডিয়া, পত্রিকা, বন্ধুবান্ধবের মাধ্যমের কথা উল্লেখ করেন। এদের ৩৬ শতাংশ তরুণ মাইকিং এর মাধ্যমে ও ৩৫ শতাংশ তরুণ বন্ধু বা প্রতিবেশির কাছে প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য পেয়ে প্রশিক্ষণে ভর্তি হয়েছিলেন।

শিক্ষণ পরবর্তী ঋণ প্রাপ্তি

আত্মকর্মসংস্থান ঋণ কর্মসূচির আওতায় প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক কোর্সে প্রশিক্ষিত যুবদের আত্মকর্মসংস্থান মূলক জন্য সকল উপজেলা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ ও প্রকল্প ভেদে সর্বনিম্ন ঋণপ্রত্যাশীকে ৬০ হাজার টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা ঋণ প্রদানের সুযোগ রয়েছে। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের কাছে প্রশিক্ষণ শেষে ঋণের ব্যবস্থা আছে কিনা জানতে চাইলে ৬২ শতাংশ তরুণ ইতিবাচক উত্তর দেন। ১১ শতাংশ তরুণ বলেন প্রশিক্ষণ শেষে ঋণ দেয়া হয়না। ২৬ শতাংশের ঋণের বিষয়ে কোনো ধারণা নেই।

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ব্রশিয়ারে তরুণদের প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে আত্মকর্মসংস্থানমূলক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার জন্য অধিদপ্তরের ঋণ সুবিধার পাশাপাশি কর্মসংস্থান ব্যাংক, জনতা ব্যাংক ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে পুঁজি প্রাপ্তিতে সহায়তা করার কথা বলা হয়েছে। সমীক্ষায় অংশ নেওয়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের মধ্যে আগ্রহীরা অন্য কোনো উৎস থেকে ঋণের জন্য চেষ্টা করেছেন- এক্ষেত্রে যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হতে কোনো সহায়তা পেয়েছেন কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ৯৩.২ শতাংশ তরুণ জানান তারা কোনোরূপ সহায়তা পাননি। মাত্র ৬.৮ শতাংশ উত্তরদাতা সহায়তা পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন। ঋণপ্রাপ্তদের ৪৮ শতাংশ জানান তারা ঋণপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে হয়রানি বা জটিলতা-র শিকার হয়েছিলেন।

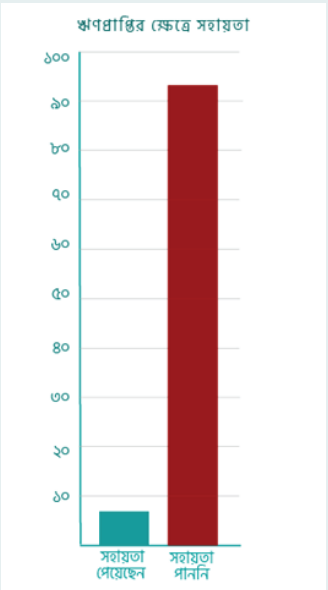

প্রশিক্ষণ ভাতা

প্রশিক্ষণে অংশ নিতে তরুণদের সহায়তা জন্য আবাসিক কোর্সসমূহে প্রশিক্ষণ ভাতা প্রদান এবং অনাবাসিক কোর্সসমূহে বিনামূল্যে আবাসন সুবিধার কথা বলা

হয়েছে। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাতা দেয় কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ২৬ শতাংশ তরুণ জানান তারা ভাতা পেয়েছেন। তরুণদের ২৬ শতাংশ জানান তাদের প্রশিক্ষণে কোনো ভাতা দেয়া হয়না এবং ৪৮ শতাংশ প্রশিক্ষণার্থী ভাতা দেয়ার বিষয়ে কিছুই জানেন না।

প্রশিক্ষণের সময়সীমার যথার্থতা

এই সামাজিক নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তরুণদের জানতে চাওয়া হয়েছিল তারা প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ সময়সীমা সিলেবাস শেষ করার জন্য যথেষ্ট মনে করেন কিনা। ৫৬ শতাংশ তরুণ জানান তারা প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দ সময় সিলেবাস শেষ করার এবং পরিপূর্ণভাবে শিখনের জন্য যথেষ্ট নয় বলে জানিয়েছেন। বাকি ৪৪ শতাংশ তরুণ এই সময়সীমাকে যথেষ্ট বলে মনে করেন। হ্যাঁ-সূচক মন্তব্যকারী এই প্রশ্নের আলোচনায় তারা পড়ার সাথে সাথে হাতে-কলমে শেখার সুযোগ বৃদ্ধি করার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। না-সূচক মন্তব্যকারীরা স্বল্প সময়ে তাড়াহুড়োয় সিলেবাস শেষ করার চাপকে প্রতিবন্ধকতা মনে করেন এবং প্রশিক্ষণগুলো আরো দীর্ঘমেয়াদী হলে আরো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে মনে করেন।

প্রশিক্ষণলব্ধ অভিজ্ঞতার বাস্তবায়িত রূপ

অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের কাছে জানতে চাওয়া হয় তারা প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা বর্তমানে কোনো কাজে লাগাচ্ছেন কিনা। প্রশ্নের উত্তরে তারা নিজেদের পোশাক তৈরি করা, নিজ বাড়িতে মৎস্য চাষ ইত্যাদি কাজ ব্যক্তিগতভাবে করেন বলে জানান। একজন মাত্র প্রশিক্ষণার্থী জানান যে তিনি নিজে বিউটি পার্লার স্থাপন করেছেন এবং বর্তমানে তা চলমান।

আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি

যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির প্রথম উদ্দেশ্য যুবক ও যুবনারীদের আধুনিক প্রযুক্তিতে হাতে কলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মমুখী সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের বা পরিবারের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে পেরেছেন কিনা তা জানতে চাইলে ৭২ শতাংশই প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে নিজের বা পরিবারের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে পেরেছেন বলে মনে করেন না বলে জানান। বাকি ২৮ শতাংশ তরুণ জানান তারা নিজের বা পরিবারের অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছেন।

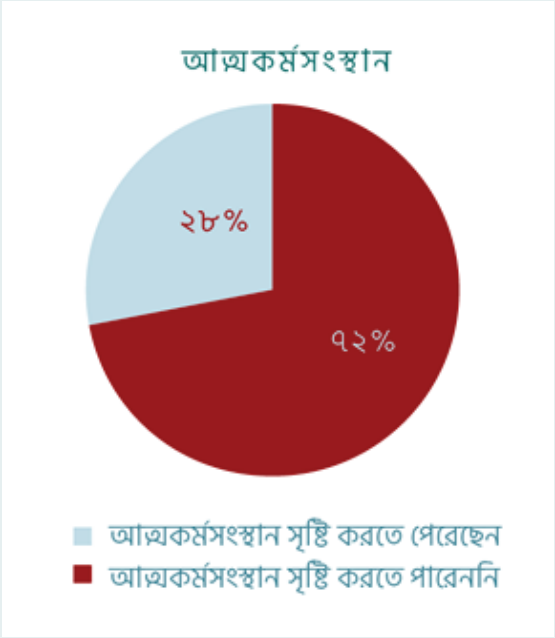

সময়োপযোগিতা ও কর্মমুখীতা

সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারী তরুণদের ৭৯ শতাংশ মনে করেন তার গ্রহণ করা প্রশিক্ষণটি সময়োপযোগী এবং কর্মমুখী। বাকি ২১ শতাংশ তরুণ তার প্রাপ্ত প্রশিক্ষণ-টিকে কর্মমুখী এবং সময়োপযোগী বলে মনে করেন না। না-সূচক মন্তব্যকারীরা জানান প্রশিক্ষণের সিলেব-াসে আরো নতুন বিষয়াবলী যুক্ত করা প্রয়োজন। সাথে সাথে প্রশিক্ষণের সময়সীমা বৃদ্ধি করতে হবে এবং দক্ষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। কিছু তরুণ জানান প্রশিক্ষণ শেষে এই শিক্ষাকে কর্মে রূপান্তর করতে ফলো আপের ব্যবস্থা থাকলে ভালো হয়। তারা জানিয়েছেন ঋণ গ্রহণ কার্যক্রম প্রক্রিয়া সহজতর করলে অনেকেই আগ্রহী হবেন। প্রক্রিয়ার জটিলতার কারণে অনেকেরই প্রয়োজন থাকা স্বত্ত্বেও ঋণ এর জন্য তৎপরতা নেই। উত্তরদাতাদের ৫১ শতাংশ জানান প্রশিক্ষণগুলোতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ নেই। তারা বলেন প্রশিক্ষণগুলোকে সময়ের সাথে সাথে আরো প্রযুক্তিবান্ধব করে গড়ে তুলতে হবে।

প্রশিক্ষণ উপকরণের পর্যাপ্ততা

যে কোনো প্রশিক্ষণকে কার্যকর এবং সহজ করে তোলার জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ উপকরণ ব্যবহার করা হয়। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীরা যে সকল প্রশিক্ষণে অংশ নিয়েছেন সে প্রশিক্ষণগুলোতে এইসব উপকরণ, ম্যানুয়াল, মডিউলগুলো প্রশিক্ষণের জন্য যথেষ্ট কিনা জানতে চাওয়া হলে ৬০ শতাংশ প্রশিক্ষানাথী না-সূচক জবাব দেন। অনেকেই জানান ক্লাসের জন্য নির্ধারিত সময়গুলোতে শুরু হয়না। ক্লাসের সময়সীমা, প্রশিক্ষণের সময়সীমা এবং প্রশিক্ষণের জন্য উপকরণ বৃদ্ধি করতে হবে। সাথে সাথে অনেকেই উন্নত প্রযুক্তি এবং মাঠ পর্যায়ে হাতে কলমে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির উপর গুরুত্বারোপ করেন।

মান ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ক

নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের ৫২ শতাংশ তাদের অংশ নেওয়া প্রশিক্ষণগুলোর মান এবং ব্যবস্থাপনাকে সন্তোষজনক, ২৭ শতাংশ তরুণ জানান প্রশিক্ষণের সার্বিক মান ও ব্যবস্থাপনা সন্তোষজনক নয়। বাকিরা এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

মনিটরিং ও মূল্যায়ন

প্রশিক্ষণ চলাকালীন যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে আসেন কিনা- ৬৯ শতাংশ তরুণ এতে হ্যাঁ-সুচক মন্তব্য করেন। ৩১ শতাংশ তরুণ বলেন কোনো কর্মকর্তা পরিদর্শনে আসেন না। প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন বা ফিডব্যাক প্রসঙ্গে ৫৯ শতাংশ প্রশিক্ষনাথী বলেন প্রশিক্ষণ শেষে তাদের ফিডব্যাক নেয়া হয়। বাকিরা এই বিষয়ে না-সূচক মন্তব্য করেন।

প্রশিক্ষণে গ্রহণের উদ্দেশ্য অর্জন

সামাজিক নিরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীদের কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল, যে উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশ নিয়েছিলেন তা সফল হয়েছে কিনা। ২৮ শতাংশ অংশগ্রহণকারী হ্যাঁ-সূচক মন্তব্য করেন। ৬৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারী মনে করেন তার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। বাকিরা এই বিষয়ে কোনো মন্তব্য করেননি।

তৃতীয় অধ্যায়

সুপারিশ

১. বিষয়বস্তু, উপকরণ, প্রশিক্ষণ পদ্ধতি আধুনি-কায়নের মাধ্যমে প্রশিক্ষণকে সময়োপযোগী এবং প্রযুক্তিবান্ধব করে গড়ে তোলা।

২. প্রশিক্ষণ পরবর্তীতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নিজস্ব উদ্যোগ গ্রহণে তদারকি ও সহায়তা প্রদান করা।

৩. ঋণপ্রাপ্তির প্রক্রিয়ার জটিলতা দূর করতে হবে এবং আত্মকর্মসৃজনে উপযুক্ত ঋণপ্রত্যাশী তরুণদের ঋণপ্রাপ্তিতে সহযোগিতা করা।

৪. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পর্কে তরুণদের অবহিত করতে প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর আগে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে যাতে করে সকল অঞ্চলের তৃণমূল তরুণ এই বিষয়ে জানতে পারেন।

৫. অঞ্চলভেদে উপযোগিতা নির্ধারণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কর্মসুচি হাতে নেওয়া।

৬. আত্মকর্মমুখী শিক্ষায় নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করতে সচেতনতা তৈরি করা।

৭. প্রশিক্ষণের মাঝামাঝি সময়ে ঝরে পড়া বন্ধ করতে প্রশিক্ষনাথীদের জন্য নিয়মিত তদারকির ব্যবস্থা করতে হবে এবং সে অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

৯. প্রশিক্ষণের বিষয় ও সিলেবাসের উপর ভিত্তি করে বাস্তবসম্মত কোর্স মেয়াদ অনুযায়ী প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা।

১০. প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বরাদ্দকৃত বাজেটের যথার্থতা ও কার্যকারিতা নিশ্চিত করতে স্বচ্ছতা ও জবাব-দিহিতা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

১১. প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণের জন্য বরাদ্দকৃত সময়ের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা।

১২. কর্মসংস্থানের হারের ভিত্তিতে বাৎসরিক মূল্যায়ন পদ্ধতি চালু করা।

গণতান্ত্রিক বাজেট আন্দোলন
Democratic Budget Movement

oraan

Safety & Rights
Promoting Safety, Enforcing Rights

The Asia Foundation